মীরা জীবন ও সাধনা

মিতা দে বিশ্বাস

জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
দিলীপ চক্রবর্তী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৯

প্রচ্ছদ ঃ
ধীরেন শাসমল

মুদ্রণ সহায়তা ঃ
সমীর দাস

মুদ্রাকর ঃ
নিত্যানন্দ পাঁজা
মাকালী প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

অর্ঘ্য

ঈশ্বরকে দেখিনি কিন্তু উপলব্ধি করেছি
যাঁর মধ্যে তাঁরই উদ্দেশ্যে—

শ্রীচরণেষু মা—তোমাকে

নিবেদন

মীরা ভারতবাসীর অতি আপনার জন, কাছের মানুষ। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মরমী ভক্তের নাম সর্বজনবিদিত। যুগে যুগে কালে কালে ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক মহাপুরুষ। সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরা চির অক্ষয় হয়ে আছেন। শ্রদ্ধাবানকে যোগ্য মর্যাদা দিতে ভারতবাসী কোনদিনই কার্পন্য করেনি তাই মানুষের মনে তাঁদের আসন আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। মীরা তাঁদেরই অন্যতম। ভাবসাধনার পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁকে শুধু সাধিকার মর্যাদা দিয়েই ভারতবাসী তৃপ্ত হয়নি। ভালবেসেছে হৃদয় দিয়ে, অনুভব করেছে অন্তরের অন্তঃস্থলে। মীরার সাধনা আত্মনিবেদনের সাধনা। অন্তরে অনুরাগের শতদল প্রস্ফুটিত করে তিনি নিবেদন করেছিলেন তাঁর পরম দয়িতের উদ্দেশ্যে—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে। মীরার অপ্রাকৃত জীবনের এই প্রেমরসরঞ্জিত আত্ম-নিবেদন রসোচ্ছল যমুনার তরঙ্গ বিভঙ্গে সপ্তরাগরঞ্জিত ইন্দ্রধনু রচনা করে আজও ভক্ত হৃদয়ের অনুভাবনাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে। এ তারই কাহিনী—সেই অত্যাশ্চর্য সাধনার—অলৌকিক উপলব্ধির—সেই পরম পিপাসার।

এই প্রসঙ্গে বলা বিশেষ প্রয়োজন স্বনামধন্য পরিচালক শ্রদ্ধেয় নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহই এই বইটি রচনার প্রধান সহায়ক। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম জানাই।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রকাশককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মিতা দে বিশ্বাস

ভোর হতে এখনও অনেক বাকি। রাত পোহাব পোহাব করছে। শেষ রাত। রাতভোরের আকাশ বেয়ে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে গাছের মাথায়—যেন রূপোলী তবকের আস্তরণ। সাদায় কালোয় মাখামাখি আকাশটা এখন শ্লেট পাথর। গাছের ছায়ায় ছায়ায় জোনাকী জ্বলে। পাতায় পাতায় ফিসফিসানি। শুভ্র মেঘের লম্বা সারি চলেছে অন্তরালের দিকে। তারার চুমকি জ্বেলে আকাশ কথা বলে। নীরব ভাষা। উষার স্তুতি পাঠক পাখিরা এখনও জাগেনি।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল সে। অনন্ত আকাশ, অনন্ত জিজ্ঞাসা। আর কতদিন? কত অপেক্ষা? এ অপেক্ষার কি শেষ হবেনা কোনোদিনও? ভাবে সে। বড় কষ্ট তার। বড় যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার কি শেষ নেই? ওরা বোঝেনা। কেউ বলে পাগলিনী, কেউ বলে সন্ন্যাসিনী। তাতে কিছু যায় আসেনা। সে এখন কারো কথায় কান দেয়না। যে যা বলে বলুক। কিই বা যায় আসে? নিজে সে এখন আত্ম সমাহিত। ধ্যান জ্ঞান এখন গিরিধারীলাল।

সে এখন দ্বারকায়। গিরিধারীলালের নিত্য লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে কেন যে দ্বারকায় চলে এল তা কি নিজেও জানে? মন টেনেছিল। কিন্তু কেন? জন-সমরণের সাথী রয়ে গেল বৃন্দাবনে—তবু সে চলে এল। একথাই বলে সকলে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? গোপীনাথ যে এখন তার হৃদয়েই ফেরে সর্বদা ওরা কি জানে সেকথা। ওরা না জানুক। কিন্তু সে তো জেনে গেছে। গিরিধারীর ব্রজ-ভূমি তো এইখানেই—এই হৃদয় বৃন্দাবনে। চরম সত্য উপলব্ধি করেই তো এতদূরে চলে আসতে দ্বিধা হয়নি এতটুকুও। গিরিধারীর নিত্যলীলা এখন তারই হৃদয়মন্দির-ধামে, এই-ই তো বৃন্দাবন। বিচ্ছেদ ব্যথা তেমন করে আর কাঁদায়না—মিলনানন্দে ভরপুর সে। মন মজে গেছে। তবু যন্ত্রণা ওঠে।

বৃন্দাবন বড় মধুর নাম। মনে পড়ে কত কথা। কত কাহিনী। ছোটবেলায় শুনেছে শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। ব্রজের ৮৪ ক্রোশ প্রভুর লীলাক্ষেত্র। ব্রজের ভাব বড় মধুর সেখানে যুক্তিতর্কের কোন বালাই নেই? প্রেমের ভাব, বন্ধুর ভাব, স্নেহের ভাবে মাতোয়ারা বৃন্দাবনবাসী সকলেই তাকে পেতে আকুল। আপনভাবে অতি প্রিয়জনের মতো।

বরাহপুরাণ বলে বরাহরূপী নারায়ণ যখন নিজের দাঁতের ওপর পৃথিবীকে ধারণ

করে চলতে শুরু করলেন তখন পৃথিবী প্রশ্ন করেছিল "হে পরিত্রাতা, মহাপ্রলয়ের ফলে চারদিকেই তো শুধু জল দেখতে পাচ্ছি আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ? আমার আশ্রয় কোথায় ? তখন বরাহরূপী নারায়ণ বললেন—যেখানে শুধু সবুজ পত্রাবলী দেখতে পাবে সেখানেই তোমার স্থান। অনেকক্ষণ চলার পরে পৃথিবী দেখলেন এক জায়গায় বৃন্দা ও লতার কুঞ্জ সাজানো রয়েছে। তার কোল ঘেঁসে বয়ে চলেছে নীলবর্ণা এক নদী। সেখানে পৌঁছে শ্রীভগবান বললেন "এই ধামই শ্রীব্রজধাম বৃন্দাবন যা মহাপ্রলয়েও ধ্বংস হবেনা।

পাদ্মে পাতাল খণ্ডে আছে—

পার্বতী যখন মহাদেবের কাছে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন মহাদেব বললেন—

"কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাতগুহ্যোত্তমম্।
রহস্যানাং রহস্যং যৎ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্ ॥
ত্রৈলোক্য গোপিতং দেবী দেবেশ্বর সম্পূজিতম্।
ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদি সেবিতম্ ॥

হে প্রিয়তমে, তোমার নিকট গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য, রহস্য হইতেও অতি রহস্য এবং দুর্লভ হইতেও অতি দুর্লভ শ্রীবৃন্দাবনের কথা বলছি শোন। হে দেবী—এস্থান ত্রিভুবনের মধ্যে গোপনীয়তম দেবেশ্বর দ্বারা পূজিত। ব্রহ্মাদিরও আকাঙ্ক্ষিত এবং সুরসিদ্ধগণদ্বারা সেবিত।

"ভূমিশ্চিন্তামণি স্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্।
বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভিবৃন্দ সেবিতাঃ।
স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষোঃ বিষ্ণুস্তদংশাংশ সমুদ্ভবঃ।"

শ্রীবৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণির ন্যায় জল অমৃত সমান। তরুগণসকল সুরদ্রুম-সম এবং সুরভিগণ দ্বারা সেবিত। সেখানকার নারীগণ সকলেই লক্ষ্মীঃ—পুরুষগণ বিষ্ণু এবং তাদের অংশজাত সকলেই শ্রীহরির অংশ।

শুদ্ধ সত্ত্বৈঃ প্রেম পূর্ণৈ বৈষ্ণবৈ স্তদনাশ্রয়ম্।
পূর্ণ ব্রহ্ম সুখমগ্নং স্ফুরত্তন্মূর্তি তন্ময়ম্ ॥

শুদ্ধ সত্ত্ব প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণবগণ সদাই বৃন্দাবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন—সকলেই পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দে মগ্ন এবং তন্ময়ভাবে তন্মূর্তি স্বরূপে বিরাজ করছেন।

মন্দমারুত সংসিক্ত বসন্ত ঋতু সেবিতম্।
পূর্ণেন্দু নিত্যাভ্যুদয়ং সূর্যমন্দাংশু সেবিতম্।
অদুঃখ সুখ বিচ্ছেদ জরামরণ বর্জিতম্।
অক্রোধগত মাৎসর্যমভিন্নমনহঙ্কৃতম্ ॥

বৃন্দাবন সর্বদাই মন্দমারুত সংসিক্ত বসন্ত ঋতু, পূর্ণজ্যোৎস্না ও মন্দাংশু সূর্যদেব দ্বারা সেবিত হয়। সেখানে জরামরণ, সুখ, বিচ্ছেদ দুঃখ নেই। ক্রোধ, মাৎসর্য, অহঙ্কার নেই।

গোবিন্দ দেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্ম সুখাশ্রয়ম্ ।
মুক্তি স্তত্র যতঃ স্পর্শাওন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে ।।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং তদ্ধাম ।।

পূর্ণব্রহ্ম সুখের আশ্রয় এই বৃন্দাবন শ্রীগোবিন্দের দেহ থেকে অভিন্ন—বৃন্দাবনের স্পর্শেই যখন মুক্তিলাভ ঘটে তখন এর মাহাত্ম আর কি বর্ণনা করা যায়? সুতরাং হে দেবি —সর্ব্বান্তঃকরণে বৃন্দাবনকে হৃদয়ে ধারণ কর।

এছাড়া শ্রুতিতে আছে রাধারানীর ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা একটি প্রধান নাম। রাধিকার অর্থাৎ বৃন্দার রমনীয় ক্রীড়াবণ শ্রীবৃন্দাবন নামে পরিচিত। আরও প্রাচীন কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীতির জন্য গোলোকে ঐ বন নির্মাণ করেছিলেন পরে পৃথিবীতে তাই বৃন্দাবন নামে সুবিদিত হয়।

যুগে যুগে মানুষ তার ভক্তির ডালি সাজিয়েছে, আরতি করেছে তাদের প্রাণপ্রিয়কে। বীরকুয়রীও তাঁর শেষ সাধনার ধনটিকে বড় যত্নে বড় স্নেহে দান করেছিলেন সেই নন্দ নন্দনকে। না হলে এমন হবেই বা কেন। যদিও সে তখন খুবই ছোট তাহলেও গিরিধারীলালের সঙ্গে মেয়ের বিয়েব ভাবনা এমনভাবে ভাবতে গেল কেন বীরকুয়রী? যদি কোনো সন্দেহ থাক, সংশয় থাকত—পারত কি সেদিন অমন নিশ্চিন্ত পবিত্রতায় মাখামাখি হয়ে গোবিন্দের পাদপদ্মে মেয়েকে সঁপে দিতে?

লালা রাজপুত সুরতান সিংহের কন্যা ছিলেন বীরকুয়রী। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আর ভক্তির ঐশ্বর্যে অসামান্যা রাজপুত রমনী। বিশ্বাস আর ভালবাসার মাধুর্যে অনন্যা। তাঁরই আদরের একমাত্র কন্যা সে। নাম রাখা হয়েছিল মীরা। কে রেখেছিল তার নাম? জানে না সে কথা। খুব ছোট বয়সেই মাকে হারিয়েছে মীরা। জন্মদুখিনী সে। তারও জন্মের আগে এক ভাই এসেছিল মায়ের কোল আলো করে—নাম ছিল গোপাল সিংহ। সে বাঁচেনি। তারপরই মীরার জন্ম। দুদাজীর কাছে শুনেছে তার জন্মের সময় নাকি আশ্চর্য এক জ্যোতি দেখা গিয়েছিল—সেও কি সত্যি? ওসব কথায় এখন আর মন রাঙে না। গিরিধারী যে সদাসর্বদাই সঙ্গে ফেরে—ফিরে যেতে বলে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মীরা দুদাজীর কাছে মানুষ। যদিও কুড়কী তার জন্মস্থান তবু সেখানে বেশি সময় কাটেনি। শিশু বেলাকার অস্পষ্ট ছায়ায় ঢাকা কুড়কী আজ ধরা পড়ে অন্য চোখে—মনের আয়নায় জমে থাকা ধুলো উড়ে যায়। চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট দেখতে পায় বাবা রত্নসিংহ তখনও জীবিত। মেড়তা সিটি থেকে আঠারো মাইল দূরে কুড়কী গ্রাম। রাজপুতানার শুষ্ক মরুভূমির বুকের ওপর স্বর্গের নন্দনকানন যেন। মরুভূমির শুষ্কতা যেন তপস্বিনী ধরণীকে আরও তেজস্বিনী করে তুলেছে। বহু সাধনাক্লিষ্ট তপোভূমি। তপস্যা আর তপস্বিনী—যেন শরীর আর আত্মা প্রকৃতি আর পুরুষ। যাদের শুভমিলনে সৃষ্টি হয় নব নব ভাবগাথা—আবির্ভাব হয় নব জীবনের।

মনে পড়ে মায়ের কথা—সে একদিন। বাড়ীর সামনে দিয়ে একদল বরযাত্রী

যাচ্ছে। বালিকা মীরা অবাক হয়ে চেয়েছিল সেদিকে। নতুন বরকে দেখে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল।

—মা আমার বর কে হবে ?

—বীরকুয়রী স্মিতহাস্যে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, পরম নিশ্চিন্ততায় বললেন—গিরিধারী গোপালই তোমার বর হবে মা। মায়ের অন্তর অনায়াসেই উপলব্ধি করেছিল এ যে সে মেয়ে নয়। সাজানো মানুষ কোনদিনই তার কাছে যোগ্য স্থান পাবেনা। অনাগত ভবিষ্যতের দৃশ্য এঁকেছিলেন মা—অক্লেশে সমর্পন করে ছিলেন নন্দ নন্দনের শ্রীচরণে। মীরা সেদিন বোঝেনি একমুহূর্তে কত কঠিন সাধনার ইঙ্গিত পেয়েছিল সে। বালিকাসুলভ চপলতায় গিরিধারী তখন থেকেই তার খেলার সাথী। রত্নসিংহ ধর্মপরায়ণ মানুষ। বীর যোদ্ধা কিন্তু দেবদ্বিজে ভক্তি অটল। বৈষ্ণব মহাত্মারা প্রায়ই আসতেন তার আতিথ্য গ্রহণ করতে। রত্নসিংহ যথাসাধ্য সেবা করতেন। সেদিন এলেন এক মহাত্মা। সঙ্গে গিরিধারী গোপালের একটি ছোট মূর্ত্তি। মীরা সাধুজীর কাছে সেই মূর্ত্তি দেখে আনন্দে আত্মহারা। ঐ মূর্ত্তি তার চাই। সাধুজী পড়লেন মহা বিপদে। নিজের ইষ্টকে কি করে অন্যের হাতে সমর্পণ করবেন ? এই চিন্তায় রাতে তাঁর ঘুমই হল না। ওদিকে মীরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। ভোর রাতে সাধুজীর একটু নিদ্রা এল তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং প্রভু তাঁকে বলছেন "তুমি অবিলম্বে আমার মূর্তি মীরাকে দান কর"—প্রভুর আদেশ পেয়ে পরদিন নিজ ইষ্ট কে মীরার হাতে সম্প্রদান করে—সাধুজী চলে যান। সেই থেকে গিরিধারীর সেই মূর্ত্তিটিই মীরার ধ্যান জ্ঞান ভালবাসা হয়ে উঠল। খেলাচ্ছলে নিজেকে নিবেদন করতে শিখল মীরা। প্রভুর কাছে তার সদাই আসা যাওয়া। সরল বিশ্বাসে রাঙানো হৃদয়ে ভক্তির চারা ক্রমেই ধৈর্যের রোদ, সহনশীলতার বাতাস আর ভালবাসার জল পেয়ে পেয়ে কখন যে ডালপালা মেলে দিয়েছে তা কেউ জানতে পারেনি। শিশুর হৃদয় ভিজে মাটির পথ। সেখানে গিরিধারীর চরণ চিহ্ন ক্রমশঃই কঠিন বিশ্বাসের খরতাপে দৃঢ় হয়ে উঠেছে—প্রেমের অংকুর মহীরুহ আকার নিয়ে হৃদয় অভ্যন্তরে শিকড় গেড়েছে—এক সময়ের খেলার সাথী কখন যে প্রাণপ্রিয় হয়ে ধরা দিল তা মীরাও জানেনা। যখন উপলব্ধ করল, সারা পৃথিবীটাই তার কাছে অন্য আকার নিয়েছে। ভালবাসার আগুনে মীরা তখন দগ্ধপ্রায়।

আরও আগের কথা—খুব শৈশবকালে মীরা স্বপ্ন দেখেছিল গিরিধারীর সঙ্গে তার বিবাহ হচ্ছে। সেই বিবাহের দৃশ্য বড়ই বিচলিত করেছিল শিশু মীরাকে—মাকে বলেছিল—

মাই মহীনে সুপনে মে পরণ গয়া জগদীস।
অংগ অংগ হলদী মৈ করী জী সুধে
ভীজ্যো গাত।
মাই মহীনে সুপণে মে পরণ গয়া দীননাথ।।
ছপ্পন কোট জহাঁ জান পধারে—

দুলহ শ্রীভগবান।
সুপনে মে তোরণ বাঁধিয়া জী সুপণে মে আইজান
মীরী কে গিরিধর মিল্যাজী পূরব জনমকো ভাগ
সুপণে মে মহীনে পরণ গয়াজী হো গয়া
অচল সুহাগ ॥

মা, স্বপ্নে জগদীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেছে। বিবাহের সময় আমরা অঙ্গে হলুদ মেখেছি। ছাপ্পান্ন কোটি রাজভবনে আমার পতি শ্রীভগবান এসেছিলেন। পূর্বজন্মের অনেক ভাগ্যে আমি গিরিধরকে পতিরূপে পেয়েছি – তিনি স্বপ্নে আমাকে বিবাহ করে গেছেন, আমার কী সৌভাগ্য।

সেসব কথা আজ আবার নতুন করে মনে পড়তে চায়—কত স্মৃতি। বেদনা আনন্দ মিলেমিশে একাকার। সুখ না থাকলে দুঃখ নেই—দুঃখ না থাকলে সুখ নেই। আজ পরিণত বয়সে পেঁছে মীরা নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত চিরে চিরে উপলব্ধি করতে চেয়েছে—কিন্তু না তবু অঙ্ক মেলেনি। জীবনের সব অঙ্ক মেলেনা। অনেক বাকি থেকে যায়। মীরারও কিছু বাকি রয়ে গেছে বৈকি। গিরিধারী যতই আপন হোকনা কেন তবুও তো মীরা রক্তমাংসে গড়া এই মাটির পৃথিবীরই শরীর নিয়ে ফেরে এখনও। মানবিক আবেদনকে পুরোপুরি অস্বীকার করা কি সম্ভব? আর কেনই বা করবে? মাটির পৃথিবীতো কোন অন্যায় করেনি বরং তাকে জন্ম দিয়ে ধন্য করেছে। মীরা জানে আজ সে অনুভূতির যে পর্যায়ে আছে সাধারণ মানুষ তাকে অলৌকিক ভাবে। সময় ভাবতে শিখিয়েছে। মীরা দেবী মীরা ভগবতী। তাকে ধরা যায়না, ছোঁয়া যায়না স্পর্শ করা যায়না। এমনই এক মনোভাব। মীরা কষ্ট পায় কাঁদে অনেক চেষ্টা করেও ওদের বোঝানো সম্ভব হয়নি সবকিছুর শেষে মীরা আজও পঞ্চভূতে গড়া একটি শরীরমাত্র। পার্থিব অনুভূতি আজও তাকে নাড়া দেয়। হোক না সে পবিত্র শরীর মুক্ত আত্মা। গিরিধারী তার স্বামী সত্যিই সেকথা কিন্তু সব ছাপিয়ে সে যে নারী তাকে তো অস্বীকার করা চলেনা। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি স্নেহ, ভালবাসা, মমতা এও তো সেই নন্দনন্দনের আশীর্বাদের কুঁড়ি, সাধনার অঙ্গ। মানুষকে না ভালবাসলে সব সাধনাই তার ব্যর্থ—গিরিধারীতো বলেননি মানুষকে উপেক্ষা করতে অবহেলা করতে। বরং আরো গভীরভাবে ভালবাসতে বলেছেন। সেই সংশয়েই আজ দোদুল্যমান মীরা। কতটা পেরেছে সে সফল হতে? সকলকে সমান করে ভাল বাসতে পেরেছে কি আজও? কোথাও ত্রুটি থেকে যায়নিতো? ভুল যদি কোথাও থেকে থাকে তবে আরো সময় লেগে যাবে—মীরা আর পারেনা বড় ক্লান্ত সে। এখনও যেতে হবে—তবে আর দেরী নেই। সে ডাক দিয়ে গেছে। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে মীরা তার ডাক শুনতে পায় সে বাঁশি বাজায়। একসময় কৃষ্ণবিরহে পাগলিনী রাধারাণী যমুনার কালো জলে তার প্রাণপ্রিয়কে অনুভব করে প্রিয় সখী ললিতাকে নিয়ে সেই যে ঝাঁপ দিয়েছিলেন আর ওঠেননি। মীরাও ভাবে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে

সে কেন এত বাঁশি বাজায় ? উন্মাদনা জাগে। পার্থিব শরীর রয়না, মন হারিয়ে যায় মিশে যায়। মীরা কুঞ্জপথে বিচরণ করে ফেরে—আর কত সময় ? কত অপেক্ষা ? এ অপেক্ষার কি শেষ নেই ?

টুকরো টুকরো ছবি টুকরো টুকরো ঘটনা। সব মিলিয়ে মীরার জীবনের ইতিহাস দীর্ঘ। কাল রাতে মীরার একেবারেই ঘুম হয়নি। মন বড়ই চঞ্চল হয়ে আছে। গতকাল আবার চিতোর থেকে পত্র এসেছে। কিন্তু মীরা নিরুপায়। অসহায়তার যন্ত্রণা অপরিসীম—সে যন্ত্রণা তার একার, বড় নিজস্ব। যন্ত্রণাই তো সৃষ্টি করে—সে যে কোন যন্ত্রণাই হোকনা কেন। ব্যথার তীব্রতাই তো প্রেমের হোমানল জ্বালে। এতদিনে কি তবে শেষ পরীক্ষার সময় এসেছে ? এ পরীক্ষায় কি উতরে যেতে পারবে সে ? সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান যে মাতৃহৃদয় এবার সেখানেই আঘাত হেনেছে গিরিধারী—চূড়ান্ত পরীক্ষা—যদি পারে সফল হতে তবেই সার্থকতা—অগ্নিপরীক্ষা। "হে প্রভু, এমন করে আর কষ্ট দিও না।" দুচোখের কোন বেয়ে নেমে আসা অশ্রুধারা আর বুঝি বাঁধ মানেনা। "এখনও কি পরীক্ষার অন্ত হয়নি হে প্রাণনাথ ?" অগ্নি-পরীক্ষা দিতে গিয়ে সীতা বিলীন হয়েছিলেন জননী ধরিত্রীর বুকে, কিন্তু মীরা ? তবে কি সময় আগতপ্রায় ? "এই কি শেষ পরীক্ষা প্রভু ? তাই যেন হয়।" মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে চায় মীরা "ওগো অন্তর্যামী এই শেষবারের মতো লাজ রাখো—মীরাকে আর দূরে সরিয়ে রেখো না—সে তো তোমারই, তুমি তো জান সেকথা।"

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় মীরার নীরব আর্তনাদ। স্তরের পর স্তর পেরিয়ে মহাবায়ুতে বিলীন হয় তার আকুতি—অনুরণিত হয় পর্দায়, পর্দায় ঝংকার ওঠে। সেই ঝংকারে বিশ্বজগৎ স্পন্দিত হয়। সৃষ্টির মূলে কাঁপন লাগে। ব্যথা ঠেলা দেয় আনন্দ ওঠে—। সৃষ্টির আনন্দ। সেও—দেখে, অনুভব করে ভালবাসে। তারও যন্ত্রণা ওঠে।

অব্যক্ত যন্ত্রণা, বিশ্ব প্রকৃতি গুমরে কাঁদে। অসময়ে বৃষ্টি নামল।

মীরা তখন মেড়তায়। মা মারা যাওয়ার পর দুদাজী কাছে নিয়ে গেছেন। দুদাজীর কাছেই শুনেছে মেড়তার আসল নাম ছিল মহারেতা বা মান্ধাতৃপুর। পরে মেড়তা নাম প্রচলিত হয়েছে। অনেক হাজার বছর আগে রাজা মান্ধাতা এখানে বাস করতেন। প্রথমে নাগবংশীয় রাজা, পরে প্রতীহারীদের অধীনে এবং সবশেষে মুসলিমদের হাতে চলে যায়। রাওদুদাজী তাদের হাত থেকে নগরটি উদ্ধার করে চতুর্ভুজজীর মন্দির স্থাপন করেন। মেড়তায় পৌঁছে মীরা সেই মন্দির দেখে ভক্তিতে বিভোর হয়ে পড়েছিল আজ মনে পড়ে সেকথা। তখন থেকেই মীরা সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শী। সঙ্গীত রচনা করে মনের মত করে প্রাণ ঢেলে তাকে সাজাত মীরা, সেই তো তার সাধনা—তার আরাধনা। আজও স্পষ্ট ভাসে।

দুদাজী প্রাসাদে বসে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছেন। আর সে মন দিয়ে তাই শুনছে। শুনতে শুনতে এক সময় বিভোর হয়ে পড়েছে। মহাভারতের কাহিনী

শুনতে শুনতে গোবিন্দজীকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মীরা। দাদাজী পড়ছেন, মীরার চোখে জল। ক্রমশঃ সে জল ঝরণাধারার মত অঝোরে ঝরতে লাগল। মীরার কানে আর কিছুই যাচ্ছেনা, সে এখন কৃষ্ণভাববিভোরা। দাদাজী কখন যে পড়া থামিয়ে একই দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে কিছুই জানেনা। রাত গভীর হয়েছে অন্ধকারের বুকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দাদাজী স্থিরপ্রায় ধ্যানমগ্ন, ভাবসমাধিস্থ মীরা। সময়েরপর সময় পার হয়ে গেছে প্রহর কেটেছে। বহুদিন এ ভাবেই কেটেছে তাদের—এমন ঘটনা নতুন ছিলনা রাও দুদাজী আর তাঁর নাতনীর জীবনে। প্রায়শঃই ঘটত। সেই থেকেই জ্ঞানার্জনের প্রবলবাসনা অঙ্কুরিত হয় হৃদয়ে। গদাধর পণ্ডিত আসতেন রাজবংশের কুলপুরোহিত। পুরাণ থেকে কত কাহিনী শোনাতেন ধর্মের উপদেশ দিতেন সারকথা বোঝাতেন। সব ধর্মের মূল যে একই একথা প্রথম জেনেছিল মীরা তারই কাছে—বড় সুন্দর কথা বলতেন গদাধর পণ্ডিত।

গিরিধারী তখন মনপ্রাণ ছেয়ে রয়েছে। ভাগবত পড়তে পড়তে শ্রীবৃন্দাবনের সেই নবজলধর শ্যামের সঙ্গে কুঞ্জপথে হারিয়ে যেতে যেতে আনন্দে বিরহ ব্যথায় মগ্ন হয়ে যেত সমস্ত অস্তিত্ব অনুভূতি—চোখে লাগত নেশার ঘোর—মদমত্ত হস্তিনীর মত টলত সারা শরীর—সুগন্ধ পাগল করত সমস্ত চিত্ত আর সত্তাকে। উন্মাদিনী হয়ে যেত মীরা—সেই তো শুরু তখন কি আর জানত—এর শেষ হবেনা কোনদিনও এর শেষ নেই শেষ হয় না। সবটুকুই শুধু শুরু সাধনার অন্ত নেই। সে ধরা দিয়েও ধরা দেয়না। ক্ষণিকের জন্য আসে আবার মিলায়। সে যে চির অধরা কে ধরবে তাকে? সাধ্য আছে কার? তবু তিনি আসেন। ভক্তের হৃদয়ে ভালবাসার মেঘের মত আশীর্বাদের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে। সে যে প্রেমের চির কাঙাল বড় নিঃসঙ্গ বড় একা। তাই সে বলে—আনন্দ আনন্দই ঠেলা মেরেছে সৃষ্টিকে। ব্যথার ফুলে যখন ভালবাসার ফল ধরে তখনই তো সৃষ্টি হয়—তখনই তো আমি আসি—যন্ত্রনাই তো আমাকে টানে—দুঃখই তো প্রেমের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়—তাই ব্যথা ভালবাসো বরণ করে নাও দুঃখকে। দেখোনা আমিও তো কাঁদি। সে কান্নাই তো পান্না হয়ে ঝরে পড়ে—ভালবাসার কুঁড়ি জাগে। ক্ষুদ্র প্রেমইতো বৃহত্তের সন্ধান দেয়। তাই তো তোমরা ভালবাস। সারা বিশ্বজুড়ে শুধু আমিই আছি। ফুলে ফলে, পাতায়, জলস্থলে বায়ু মহাবায়ু অনুরণিত করে আমারই অস্তিত্ব কম্পন তোলে। ঝড় আসে। অণু পরমাণু চেতনায় শুধু আমারই অস্তিত্ব। তবু এত কাছে পেয়েও আমাকে তোমরা বারে বারে হারাও—অনুভব করতে পার না। চাই সেই অনুভূতি—চাই সেই মন যে মন কাঁদে—কাঁদায় ভালবাসার সাগরে তুফান তোলে। আগু পিছু জানেনা—শুধু মাতাল হয়। বিচার করেনা—প্রেমে উন্মাদ হয় সেই তো ভালবাসা, সেই তো যন্ত্রণা, সেই তো সৃষ্টি। আমি আমারই সৃষ্টির পানে আকুল হয়ে হাত বাড়িয়ে থাকি কৈ তেমন করে তো কেউ ডাকেনা। নিঃসঙ্গতা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, প্রেমের ভিখারী করে—অনন্ত ঐশ্বর্যবান হয়েও আজও আমি পথের

ভিখারী হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরি—কিন্তু সাড়া মেলে না। স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টি নিজের খেলাতেই মেতে থাকতে চায়।

বাঁশির সুর ওদের পাগল করেনা। সেই যে কবে কতকাল আগে যমুনা পুলিনে যখন বাঁশি বেজেছিল—সাড়া দিয়েছিল গোপিনীরা, তেমন আকুল হয়ে আর তো কেউ ডাকলনা। নিজেকে দেওয়ার মধ্যেই তো আনন্দ। সমর্পনই তো ভক্তি—আত্মাহুতিই তপস্যা। নিজেকে দিতে চেয়ে দিতে না পারার কষ্ট সে তো বড় যন্ত্রনা। জানেনা কেউ।

দুদাজী বুঝেছিলেন। মীরার ভক্তির পর্যায় অনুভব করতে ভক্তের দেরী হয়নি। সময়মত বিয়ে না দিয়ে দিতে পারলে সংসারে না বন্ধ করতে পারলে এ মেয়েকে ধরে রাখা যাবে না। পাত্র দেখা শুরু করলেন দুদাজী। মীরা গিরিধারীর চরণাগতা—নিজেকে সে কুমারী ভাবতে পারে না। স্বপ্নে তো কবেই তার বিয়ে হয়ে গেছে জগদীশের সঙ্গে—। তনুমনপ্রাণ সবই তো অর্পন করা হয়ে গেছে তবে কেমনকরে আবার আরেকজনের গলায় বরমাল্য দেবে সে? এই ভাবনাতে পাগল হয় মীরা। এ বিয়ে অসম্ভব। কিন্তু দুদাজী এবং বাবা রত্নসিংহ-র আদেশ অমান্য করার মত স্পর্দ্ধাও তার নেই। নিরুপায় মীরা—কুলমর্যাদা অনুসারে এবিয়ে অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্ণগত প্রাণা মীরার জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ। আকুল হয়ে ওঠে প্রানমন। পার্থিব জগৎ তাকে আকর্ষন করেনা। ভাললাগেনা অন্যান্যদের মত হাসি গল্প নিয়ে ভুলে থাকতে। ভাললাগেনা কথা বলতে। তার যত কথা সবই তো গিরিধারীর সঙ্গে, যত গান সে রচনা করে সবই সেই নন্দ নন্দনকে নিয়ে, সে ছাড়া তার জীবনে তো আর কিছু নেই। কৃষ্ণপ্রিয়া সে। শৈশবের খেলা আজ প্রেমের পূর্ণতা পেয়েছে। রাজপুতানির দীঘল চোখের আয়নায় শুধুই প্রাণপ্রিয়র ছায়া—অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি ঘিরে পূর্ণজ্যোৎস্নার দীপ্তি, সে দীপ্তি আলোকিত করে সারা বিশ্বভুবনকে।

চতুর্ভূর্জ মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে শুধুই গান আর গান। মীরার রচিত গানে গানে মন্দির প্রাঙ্গন সজ্জিত। যত গান লেখে সে সবই মন্দির প্রাঙ্গনে লিপিবদ্ধ করে রাখেন গদাধর পন্ডিত। বড় স্নেহ করেন এই মেয়েটিকে। মীরার প্রেম যে পৃথিবীর মানুষকে একদিন পথ দেখাবে সাধনা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গানে গানে ভরিয়ে তুলেছেন মন্দির প্রাঙ্গন ইতিহাস হয়ে থাকুক মীরার সৃষ্টি। সব অনুভূতিরই নিজস্ব জগৎ থাকে। যেখান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছুরণ ঘটে না সৃষ্টিতে। নীরব সে আর্তনাদকে ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবু কখনও কখনও ইচ্ছা ঝরে পড়তে চায় সৃষ্টি হয়ে। যেভাবে মায়ের ইচ্ছা সৃষ্টি হয় সন্তান রূপে। একই তার অস্তিত্ব তবু নিজরূপে সে স্বতন্ত্র—ব্যবধান অনেক। তবু সূত্র একটা থেকেই যায়—সেই সূত্র ধরেই মীরার সঙ্গীত রচনার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। প্রাণের আকুতি ঝরে পড়তে চায় ক্রন্দন হয়ে। বুকভাঙা সে কান্না সৃষ্টি করে গভীর ব্যঞ্জনাময় সঙ্গীত—অনুভূতির বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে—

ছুটে আসে কত মানুষ। দলে দলে। মন্দির প্রাঙ্গন জুড়ে নৃত্য গীতে মুখর হয়ে ওঠে। মীরার প্রশস্তি গায়—সেবা করে দেবতার। দিনের পর দিন কাটে। মীরার আবেগ ভালবাসা পরিপূর্ণতা খোঁজে। সে আকুলতা স্পর্শ করে বহু দূর দূরান্তের মানুষকে। আকুল হয়ে ভালবাসার টানে এসে জড়ো হয়। মীরার অনুরাগীর সংখ্যা বেড়েই চলে।

পাত্র মেবারের মহারানা সংগ্রামসিংহের বড় ছেলে কুঁয়ব ভোজরাজ। শৌর্যে বীর্যে অসাধারণ মীরারই যোগ্য বর। মীরা নিরুপায়। একদিকে গিরিধারীলালের প্রেম অন্যদিকে কর্তব্য—পিতার সম্মান এই দুইয়ের মাঝখানে অসহায়া মীরা। গিরিধারী কেবলই বলছেন পঞ্চভূতে গঠিত এই শরীরটাই তো সব নয় সংসারে থেকেও আমাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসো—সেই তো তোমার সাধনা। প্রেমই তোমার ঈশ্বর, সৌন্দর্যই সাধনা, যন্ত্রনাই তপস্যা, তাই যন্ত্রনা চাই। যন্ত্রনা না পেলে কিছুই সৃষ্টি হয় না। যন্ত্রনাই তো আনন্দের উৎস। কত কষ্ট সয়ে মা আনন্দরূপ সন্তানকে লাভ করে। যন্ত্রনা থেকেই সৃষ্টি হয় বিশ্বজগৎ, ব্যথাই আনন্দকে ঠেলা দেয়। নাহলে সৃষ্টি যে অচল হয়ে পড়ত। তাই যন্ত্রনা চাই সেও তো তোমার সাধনারই অঙ্গ, আমাকে পাওয়ার পাথেয়, তাকে হাসিমুখে গ্রহণ কর—কর্তব্যে অটল থাক।

গিরিধারীর উপদেশ মেনে নিয়েছে মীরা। ভোজরাজের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেছে। মীরা এখন চিতোরের রানী। কিন্তু মন প্রাণ গিরিধারীর সেবায় যুক্ত থাকে সর্বদা। ভোজরাজ বড় উদার চেতা মানুষ। মীরাকে তিনি ভালবাসেন প্রাণের চেয়েও বেশি তাই মীরার আব্দার সহ্য করেন হাসিমুখে। আপত্তি করেন না। তাছাড়া মীরাতো সাংসারিক কর্তব্যে অবহেলা কখনও করেনা। সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি তার—তারই ফাঁকে নিজেকে ইষ্টসেবায় নিযুক্ত রাখে—তার ইষ্ট দেবতা গিরিধারীলাল কিন্তু সাধন মার্গে উচ্চপর্যায়ের সাধিকা সে, সকলের ইষ্ট দেবতা যে একই। এটুকু না বোঝার মত ধৃষ্টতা মীরার নেই। চিতোরের ইষ্টদেবী দুর্গা। সকলেরই সংশয় ছিল মীরাকে নিয়ে এক্ষেত্রে কি করবে সে? গিরিধারী ছাড়া কারো কাছে সে মাথা নত করেনা—তবে? কিন্তু সকলকে নিশ্চিন্ত করে মীরা দেবী দুর্গার সেবার ভার গ্রহণ করেছে তুষ্ট করেছে চিতোর পরিবারকে। সেই পূর্ণব্রহ্মকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র অনুভব করতে পারে মীরা, বোঝে মূর্তিভেদ শুধুই সাম্প্রদায়িক দূরত্ব বাড়ায় এর বেশি কিছু নয়—সেকথা বুঝেছে বলেই বোঝাতে পেরেছে এমন করে। নগরবাসী মুগ্ধ। মীরার ভক্তিরসে আপ্লুত তারা। মীরা গায়—ভজন রচনা করে—মন্দির প্রাঙ্গণে ভাবসাধনার তরঙ্গ বয় শিবের ভজন গায় মীরা—

শিব মঠ পর সোহে লাল ধ্বজা।
কৌন শিখর পর গৌরী বিরাজে—
কৌন শিখর পর বম ভোলা,
উত্তর শিখ পর গৌরী বিরাজে
দক্ষিণ শিখ পর বম ভোলা

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
হরিকে চরণ পর চিত মোরা ॥

অর্থাৎ শিব-মঠের উপরে লাল ধ্বজা শোভা পাচ্ছে। কোনো শিখরে গৌরী আবার কোনো শিখরে বম ভোলা। উত্তর শিখরে গৌরী বিরাজ করছেন আবার দক্ষিণ শিখরে স্বয়ং শিব বিরাজ করছেন। মীরার চিত্ত হরির শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে আছে। ভোজরাজ মীরার মানসিকতা বুঝতেন। মীরা যে আর পাঁচজনের মতো সংসারিক সুখদুঃখের মধ্যে গতানুগতিক জীবন কাটাতে আসেনি সেকথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মীরার সাধনায় কখনও বাধা দেননি। তবু বাধা এসেছিল। ভোজ-রাজের কথা মনে হলেই মীরার দুচোখে আজও জলের ধারা নামে। অমন মানুষ হয় না। যতদিন জীবিত ছিলেন দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছিলেন মীরাকে সেকথা ভাবলে এখনও উদাস হয়ে ওঠে মন। কিন্তু দাদার এত পক্ষপাতিত্ব সহ্য করতে পারত না বিক্রজিৎ আর উদাবাঈ। রাজমহিষী হয়েও মীরার সন্ন্যাসিনীর মতন জীবন যাপনের কোনো অর্থ খুঁজে পেত না তারা। শ্বশুর রাণা সংগ্রাম সিংহ মীরাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু বেশিদিন নয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মীরা চিরস্নেহবঞ্চিতা। ভোজরাজ তারও আগে মারা গেছেন। এবার শ্বশুরকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ল মীরা। বড় আদরের ছিল সে। চিতোররাজ পরিবারের এই মানুষটাই শেষ দিন পর্যন্ত পুত্রবধূকে স্নেহের সঙ্গে মর্যাদা দিয়ে গেছেন—মীরা ভোলেনি সেকথা।

তার নিঃসন্তান জীবনে স্বামী ও শ্বশুরই ছিলেন পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সাংসারিক জীবনের অবলম্বন। তাঁরাও চলে গেলেন। মীরার শেষবন্ধনটুকুও ঘুচিয়ে দিল গিরিধারী। সংগ্রাম সিংহও মৃত। সেদিন যে কি অসহ্য কষ্টের শিকার হয়েছিল সে, তা ভাবলে আজও কষ্ট হয়। শুধু কষ্ট আর কষ্ট। সারাটি জীবন শুধু যন্ত্রণার। বৈধব্য জীবনই মীরার প্রকৃত সাধনার সময় হল। প্রেম নেই, স্নেহ নেই, সংসারে চিরবঞ্চিতা নারী সে—একমাত্র সম্বল গিরিধারী। এবার সমস্ত অপূর্ণ চাওয়া পাওয়া সে অর্পণ করে দিল তারই শ্রীচরণে। ভোজরাজকে ভালবেসেছে মীরা। সম্মান করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের চরণে নিবেদিতা সে গিরিধারীই যে তার যুগযুগান্তের ভালবাসার ধন পার্থিব চাওয়া তাকে স্পর্শ করবে কেমন করে? ফাঁক থেকে গেছে। মীরা কষ্ট পেয়েছে। অতি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও অনুভব করেছে গিরিধারীকে। দুচোখ বেয়ে যন্ত্রণা নেমেছে। একজনকে দিতে চেয়ে অন্যজনকে অর্পণ করা যে কি মারাত্মক যন্ত্রণা তা সেই জানে। অসহ্য কষ্ট বয়ে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। নিজেকে দিতে না পারার কষ্ট, চেয়ে না পাওয়ার কষ্ট—এই দুই কষ্টের মেরুবিন্দুতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে, সে তারই মত। তার কোন দোসর নেই।

চিঠি এসেছে উদয়সিংহের চিঠি। মীরার হৃদয় আজ উদ্বেলিত। কৃষ্ণগতপ্রাণা জন্মসাধিকা মীরা। তবু নিঃসন্তান জীবনে উদয় বড় স্নেহের। ছোট থেকেই মীরার প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালবাসা। মীরার সন্তানহীন জীবনের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল

উদয়—রানী কারমেতন বাঈয়ের ছোট ছেলে। কারমেতনবাঈ উদয়কে মীরার স্নেহছায়া দিয়েই মানুষ করতে চেয়েছিলেন। ভক্তপ্রাণার সান্নিধ্যে উদয় বেড়ে উঠুক এই ছিল তার কাম্য। অবশ্য মীরা অনেক পরে অনুমান করেছে এছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিক। মীরা তখনও এসব বুঝত না। রাজ-পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রাজনীতি লুকিয়ে থাকে তা জেনেছে অনেক পরে। রাণী ধনবতীবাঈকে দেখে। নিজস্বার্থের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কি মর্মান্তিক পরিণতি বিশ্বাসের কি অমর্যাদা কারমেতনবাঈ বুঝেছিল রাজনীতির জাল কাটিয়ে উদয়কে রাজা করতে গেলে মীরাবাঈয়ের সমর্থন থাকা বিশেষ প্রয়োজন। মীরার সমর্থনের অর্থই ছিল মেড়তার সমর্থন। সে সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে মেড়তার প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট।

উদয় তখন খুব ছোট। রতনসিংহকে রানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে ধন-বতীবাঈয়ের ষড়যন্ত্র তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সংগ্রামসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে। কারমেতনবাঈয়ের পুত্র বিক্রমজিৎ বাবার সঙ্গেই গেছে। কন্যা উদাবাঈকে নিয়ে বিপদাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন কারমেতনবাঈ। রণবীর আর মালদেবের ষড়যন্ত্রের গোপন খবর এসে পৌঁছেছে কারমেতনবাঈয়ের কাছে। ছুটে এসেছে মীরার সাহায্য প্রার্থনায়। কৃষ্ণসেবিকা মীরা রাজনীতির জালে কোনদিনই জড়াতে চায়নি নিজেকে। চিরদিনই সরিয়ে রাখতে চেয়েছে বাস্তবতার বিভীষিকা থেকে। রাজনীতি উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে, তবু সে যে মুক্তপ্রাণা, স্বার্থান্বেষী মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই তার সাধনার ক্রমউত্তোরণ। কি করবে সে? তবু কারমেতন-বাঈয়ের চোখের জলকে অমর্যাদা করতে পারেনি। সন্ন্যাসিনীর হৃদয়েও মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আহবান করুণ কাতর আর্তনাদ সেদিন সাড়া না জাগিয়ে পারেনি। উদয়কে রক্ষার ভার গ্রহণ করেছে মীরা।

রণবীর আর মালদেবের উদ্দেশ্য ছিল উদয়কে হত্যা করে রতনসিংহকে সিংহাসনে বসানো। কার্যতঃ তারাই রাজ্যশাসন করবে যদিও ধনবতীবাঈ প্রধানমন্ত্রী হবেন।

সংগ্রামসিংহ ও বিক্রমজিতের অনুপস্থিতির সুযোগে কিন্তু উদয়কে হত্যা করে রতনসিংহকে সিংহাসনে বসাতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। যুদ্ধশেষে যদি মহারাণাকে সীমান্ত পেরিয়ে চিতোরে ঢুকতে না দেওয়া হয় তাহলে পথ একেবারেই নিষ্কণ্টক। বিক্রমজিতেরও সিংহাসনে আরোহণের পথ চিরতরে বন্ধ।

সেদিনকার কথা ভাবলে আজকের মীরা আজও শিউরে ওঠে। কি ভয়াবহ রাত। রতনসিংহ কিন্তু জানত না যে উদয়কে হত্যা করা হবে। রণবীর আর মাল-দেবের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছে উদয়—রতনসিংহ তখনও জানে না। কি জঘন্য নিষ্ঠুর পরিকল্পনা। মীরা কোনদিনই সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। অন্যায়কে মেনে নেওয়া তার সয়না। হাজার হোক সে রাজপুত রমনী। তায় সাধিকা। সত্যের পথ থেকে সরে আসাতো মৃত্যুরই নামান্তর। গিরিধারীকে ভালবাসতে হলে সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে তাকে। নইলে যে সাধনা অসম্পূর্ণ

থেকে যাবে। চিতোরে সেদিন ঘোর সংকট।

উত্তেজনায় অস্থির মীরা। কয়েকদিন ধরেই চিন্তা করে চলেছে কিভাবে বাঁচানো যায় উদয়কে। অবশেষে সেদিন গভীর রাতে মন্দিরের চাতালে বসে গিরিধারীকে আকুল হয়ে ডেকেছিল, বলেছিল হে প্রভু রক্ষা কর নিষ্পাপ শিশুটিকে, ভবিষ্যৎ রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীকে। তিনি শুনেছিলেন। সেই রাতেই এক শিষ্যের মারফৎ চিঠি পাঠিয়েছিল মীরা যুদ্ধরত সংগ্রাম সিংহের কাছে। তারপর সোজা চলে এসে-ছিল কারমেতনবাঈয়ের মহলে। পরিকল্পনার কথা জানিয়ে এসেছিল ধাত্রী পান্নার কাছে। নিশুতি রাত। সারা চিতোর নিদ্রামগ্ন। উত্তেজনার বশবর্তী মীরা তখন বেপরোয়া। ঘুমন্ত পান্নাকে জাগিয়ে তাকে সবকথা খুলে বলেছিল সে। পাশের দুটি খাটে ঘুমন্ত দুটি শিশু। একটি উদয় অপরটি পান্নারই সন্তান। মীরার পরিকল্পনামত পান্না উদয়ের পোষাক পরিয়ে দিয়েছিল নিজের সন্তানকে। কী অসম্ভবই না সম্ভব করেছিল পান্না সেদিন ভাবলে চোখের উদ্গত অশ্রুধারা সংযত করতে পারেনা মীরা। প্রয়োজনে সে নিজেও সেদিন কত নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল মায়ের কোল শূন্য করে চিতোরের ভাবী উত্তরাধীকারীর কথাই ভেবেছিল—সেকথা মনে হলে আজও বড় স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনা। গভীর রাতের অন্ধকারে ফলের ঝুড়িতে উদয়কে শুইয়ে চিতোরের পশ্চিম প্রান্তে পান্নার হাতে দেবলনগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পান্নার সেখানে ঠাঁই মেলেনি। অবশেষে আরাবল্লী পর্বত পার হয়ে কমলমীর দুর্গে পৌঁছোনোর পর সেখানকার শাসনকর্তা বীর রাজপুত আশাশাহর কাছে পরিচয় গোপন করে পান্না উদয়কে নিয়ে কোনমতে আত্মগোপন করে। সেদিন আশাশাহ আশ্রয় না দিলে উদয়ের যে কি হত ভাবলে শিউরে উঠে মীরা।

ওদিকে মীরার চিঠি পেয়ে সংগ্রামসিংহ ফিরে এসেছেন অনেক আগেই। রণবীর আর মালদেবের সাহস হয়নি তাঁকে বাধা দেবার। তাছাড়া তারা জানত উদয় মারা গেছে। ধাত্রী পান্নার এত বড় আত্মোৎসর্গের কথা জানতনা কেউ। নিজ সন্তানকে এভাবে বলি দেবার নজির ইতিহাসে বিরল। শুধু জেনেছিলেন সংগ্রাম সিংহ। মীরাই জানিয়েছিল। এক গোপন বৈঠকে তার সমস্ত পরিকল্পনার কথা শ্বশুরকে জানিয়েছিল সে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সংগ্রামসিংহ। চিতোরের ভাবী উত্তরাধি-কারীকে এভাবে রক্ষা করার জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন পুত্রবধূটিকে। তার অসামান্য বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ না করে পারেননি। ধনবতীবাঈ লজ্জায় অপমানে এরপর আর মুখ তুলতে পারেন নি।

কতদিন আগের কথা তবু মনে হয় যেন আজকের। ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৃশ্যগুলো। সেই উদয় আজ কতবড় হয়েছে। ডেকে পাঠিয়েছে তাকে চিতোরে ফিরে যাওয়ার জন্য। চিতোরের আজ বড় দুর্দিন।

সংগ্রামসিংহ সেদিন মীরার কাছে উদয়ের খবর পেয়ে আশাশাহর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন। আশাশাহ আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন উদয় তার কাছে নিরা-

পদেই থাকবে। ভবিষ্যতে যদি কখনও তার রাণা হবার সুযোগ দেখা দেয় আশাশাহ সাহায্য করবে—সংগ্রামসিংহ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সেই থেকে শুরু, নিরাপদ আশ্রয়ে বড় হতে লাগল উদয়। শত্রুরা কেউ জানলনা। জানল শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণী মীরা, সংগ্রামসিংহ আর কারমেতনবাঈ। উদয়ের প্রাণরক্ষার জন্য মীরাকে কৃতজ্ঞতা-জানাবার কোন ভাষা খুঁজে পায়নি কারমেতনবাঈ। শুধু কেঁদেছে। নীরব সে ভাষায় মাতৃহৃদয়ের ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছে মুক্তি পেয়েছে মীরা।

এরপরেও মহারাজা সংগ্রামসিংহকে আবার যুদ্ধে যেতে হল। পাণিপথের যুদ্ধ তখন সমাপ্ত। বাবর জিতেছে। ইব্রাহিমলোদীকে পরাস্ত করে চিতোর জয়ের পরি-কল্পনা ছিল তার। সংগ্রামসিংহকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে হল। যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি এবার যাতে পুরানো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তবু বিপদ এল। রণবীরের দল বিষপ্রয়োগে হত্যা করল মহারাণাকে। চিতোরে এ সংবাদ এসে পেঁাছোতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সকলে। অনেকেই বুঝেছিল চিতোরের দুর্দিন এগিয়ে এসেছে। সিংহাসন রক্ষা করার মত যোগ্য উত্তরাধিকারী নেই। তবু রতনসিংহকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রণবীর এবং মালদেবের চক্রান্ত পুরোপুরি সফল। কী জঘন্য রাজনীতি। মীরা ভাবে। তবু এসবের মধ্যেও চলেছে তার অনলস সাধনা, মীরা বড় একা। নিঃসঙ্গ রাজপুরীতে এখন একটি মানুষ নেই যাকে সে সব কথা বলতে পারে। বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে যায় যন্ত্রণা বাড়ে। তবু নিশ্চুপ মীরা। মন খারাপ লাগলে মন্দিরে চলে যায়, সেখানে বসে গায়—

আলো মঁহানে লাগে বৃন্দাবন নীকো
ঘর ঘর তুলসী ঠাকুর পুজা দরসন
গোবিন্দজীকো।
নিরমল নীর বহত জমনামে, ভোজন দুধ দহীকো
রত্নসিংহাসন আপ বিরাজে মুগট ধরয়ো তুলসী কো।
কুরজন কুরজন ফিরত রাধিকা
সবদ শুনত মুরলী কো
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, ভজন বিনা
নর ফীকো॥

ওগো বৃন্দাবন আমার বড় ভাল লাগে। ঘরে ঘরে তুলসী যমুনাতে নিরমল জল বয়ে চলেছে। দধি দুগ্ধ ভোজ্যবস্তু। তিনি রত্ন সিংহাসনে বিরাজ করছেন। তুলসীর মুকুট মাথায়। কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধা প্রভুর মুরলীধ্বনি শুনতে পাচ্ছে—মীরার প্রভু গিরিধরের ভজন ছাড়া মনুষ্য জন্মই বৃথা।

বৃন্দাবন বড় টানে। মীরার স্বপ্নের বৃন্দাবন। সেখানে পায়ে পায়ে স্বপ্ন ঘোরে। কুঞ্জবনের নিম্নমুখী লতারা এসে জড়িয়ে ধরে শ্রদ্ধা জানায় ভালবাসে সেই নন্দ নন্দনের উদ্দেশ্যে। বড় ভাল লাগে মধুময় শ্রীবৃন্দাবনের ধুলি, স্বপ্ন দেখতে দেখতে

মীরা হারিয়ে যায়। মন্দিরে ভাগবত আলোচনা বসে। মীরা বলে নগরবাসী শোনে, বুঝি মন্ত্রমুগ্ধ তারা আকাশে পূর্ণচন্দ্র রাশ পূর্ণিমা! মীরা বৃন্দাবনে। চতুর চূড়ামণি শ্যামসুন্দরকে দেখে গোপিনীদের অন্তরে শুধুই ভারতরঙ্গের ঢেউ। তারা কি যেন বলতে চাইছে কিন্তু লজ্জা সংকোচ বাধা সৃষ্টি করছে। শ্যামসুন্দর তাদের উপলব্ধি করে মৃদু মৃদু হাসছেন, বলছেন—

স্বাগতং বো মহাভাগা। প্রিয়ং কিং করবানি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রতাগমনকারণম্ ।।
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্ব নিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমা ।।

হে মহাভাগ্যবতী ব্রজরমনীগণ। তোমাদের এখানে আসার কারণ কি বল, এই রাত্রিতে হিংস্রজন্তু, পরিপূর্ণ স্থানে স্ত্রীলোকের এখানে আসা কোনমতেই উচিত নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরে যাও।

কি কথার চাতুর্য। বিদগ্ধ ভঙ্গীবিলাস? অথচ তিনি সবই জানেন। গোপীদের অন্তরের ভাব তাদের মুখমণ্ডলেই প্রতিভাত হচ্ছে। তবু তিনি প্রশ্ন করলেন। কারণ নিজমুখে তিনি তাদের অন্তরের গভীর ভালবাসার কথা শুনতে চান। তাদের মুখ থেকে ভালবাসার কথা শোনা অনেক বেশি আনন্দের। কিন্তু গোপিনীরা নির্বাক। তাদের বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা।

গোপীরা কিছুতেই তাদের মনের কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলতে পারছে না। প্রেম অপ্রকাশ্য। শুধুই অনুভূতি। কিছু ব্যক্ত কিছু অব্যক্ত। অপ্রকাশেই প্রেমের পূর্ণদীপ্তি জাজ্বল্যমান। প্রকাশে তার সৌন্দর্য বিছুটা ম্লান। তাই গোপিনীরা অব্যক্ত। কিন্তু শ্যামসুন্দর কোনো আবরণই রাখবেন না। তিনি সবটাই প্রকাশ করবেন। কোনো আবরণ রাখবেন না। বস্ত্রহরণের দিন শরীর দেখেছেন, আজ দেখতে চান অন্তরকে—উপলব্ধি করতে চান। গোপিনীরা বামা এবং দক্ষিণা এই দুই স্বভাবের। দক্ষিণা নায়িকা সামান্য ইঙ্গিতেই নিজেকে উন্মোচন করে তারা নায়কের অনুকূল, কিন্তু বামা নায়িকার পক্ষে হৃদয় উন্মোচন দুঃসাধ্য। তারা শ্রীকৃষ্ণের বামে থেকেও বামনয়না। এদেরকে নিয়েই শ্যামসুন্দর খেলতে ভালবাসেন। বামা নায়িকার কাম্য ত্যাগ করানোই তাঁর আজকের উদ্দেশ্য। তাই বৈচিত্র্যময় বাগ ভঙ্গীর সাহায্য নিয়েছেন চতুর চূড়ামণি প্রত্যেক শব্দের মধ্যে তীব্র উপেক্ষা, গোপিনীরা আজ আহত।

এভাবেই ব্যাখ্যা করে মীরা। মন্ত্রমুগ্ধের মত নগরবাসী ভারতরঙ্গে দোল খায়। ভক্তিরসে আপ্লুত হয় তারা। মীরা তাদের মাথার মুকুটমণি। আবেশে মীরার তনুমন আন্দোলিত। রাশলীলা বর্ণনা করতে করতে নিজেই সমাহিত হয়ে পড়ে সে। কখন যে রাত গভীর হয় টের পায়না। কারমেতনবাঈ এসে ডাকে। অনেক অনেক রাতে প্রাসাদে ফেরে মীরা। সে এখন অতি উচ্চপর্যায়ের সাধিকা। সকলেই তাকে ভালবাসে কয়েকজন ছাড়া।

আশাশাহর কাছে উদয়ের দিন ভালই কাটছিল। কিন্তু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার রাজোচিত আচরণে অনেকের মনেই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। চিতোরেও সন্দেহের ঢেউ এসে লাগে। উদয় যে জীবিত একথা কানাকানি হয়েছে। খবর গোপন রাখা যায়নি বেশিদিন। বিক্রমজিতের অত্যাচারে নগরবাসী শঙ্কিত। রতনসিংহ বেশিদিন জীবিত থাকেননি। সুযোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় বিক্রমজিতকেই রাণা করা হয়েছে। নামেমাত্রই সে রাণা আসল ক্ষমতা তখনও বনবীরের হাতে। রতনসিংহের সময়েও বনবীরই সর্বেসর্বা ছিল। এখনও তাই। কিন্তু বিক্রমজিৎ সে সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। বনবীরের চক্রান্ত বোঝার মত বুদ্ধি তার ছিলনা। বনবীর যেন মহাভারতের শকুনি। মীরার মনে হয়। তার নিষ্ঠুর চক্রান্তের বলি হয়েছে চিতোর রাজপরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরা। সংগ্রামসিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে বনবীর। রতনসিংহকেও সরিয়েছে। পরে বিক্রমজিতকেও। সে অনেকদিনের কথা।

বিক্রমজিত মীরাকে সহ্য করতে পারতনা। তাই যখন তার রাজত্বকালে খবর এল মালদেব মেড়তা আক্রমণ করে অবশেষে জয় করে নিয়েছে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল বিক্রমজিত। মীরাকে জব্দ করার সময় এবার উপস্থিত। প্রথম থেকেই মীরার সাধন-পথ তার পছন্দ নয়। ভাবসাধনার এই ধারা বড়ই সৃষ্টিছাড়া লাগে তার কাছে। নাচ গানের মাধ্যমে দেবসেবা। বিক্রমজিতের অসহ্য লাগে। মীরা তার জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবা। অন্দরমহলে নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটানোই তার আদর্শ হওয়া উচিত। অথচ মীরা সেভাবে থাকেনা। অনেক বুঝিয়েও তাকে নিরস্ত করা যায়নি। নগরবাসীর সামনে নির্লজ্জভাবে নাচগান করে মীরা—বিক্রমজিত মানতে পারেনা। তার ধারণা এতে রাজ পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কিন্তু মীরা অটল। গিরিধারীর আরাধনা সে করবেই। কাজেই ক্ষমতা হাতে আসার পর দিনে দিনে আরও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে বিক্রমজিত। মীরার অত্যাচারিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ এগিয়ে আসে। নানা ফন্দী ফিকির খুঁজতে থাকে বিক্রমজিত বনবীর তার ডান হাত।

ভোরের সূর্য উঠছে। দূরের সমুদ্রতীরের আকাশে প্রভাতের রঙ ধরেছে। মীরা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। রণছোড়জীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং। বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। মুগ্ধ চোখে মন্দিরের চূড়ার দিকে চেয়েছিল সে। আকাশের বুকে গা ভাসিয়ে ভোরের পাখিরা উড়ে চলেছে। ক্রমে ছোট্ট বিন্দুর মত দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে তারা দিগন্তের বুকে। শূণ্য সমুদ্রতীর। বায়ু বয় হু হু শব্দে। মীরার বুকের মধ্যে হাহাকার গুমরে ওঠে। এখনও তো তেমন করে পাওয়া হল না। তবে কি বাকি থেকে গেল এ জীবনের সাধনা? আর তো সময় নেই। এবার যে চলে যেতে হবে। মহাকালের মন্দিরা বাজছে শুনতে পাচ্ছে মীরা। তার জীবনে আজ বিরহ মিলনের সন্ধিক্ষণ। যাহোক একটা কিছু হবে—জীবনের দুঃসহ অস্থিরতার মুহূর্তগুলো পার করে এসেছে, তবু আজ বুঝি নতুন করে ভাবার সময় আগতপ্রায়। উদয়কে পেয়ে তার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় শান্তি পেয়েছিল।

সে সময় ভোজরাজ পরলোক গমন করেছেন। একাকীত্ব ঘিরে ধরেছে মীরাকে। উদয়কে কাছে টেনে নিতে পেরে মন অনেক শান্ত হয়েছিল। সেই উদয়। মীরার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হলেও দূর থেকে বরাবরই যোগাযোগ রেখেছে মাতৃসমা এই নারীর সঙ্গে। মীরা তার প্রাণ দান করেছে একথা ভোলেনি উদয়। মীরার স্নেহের মর্যাদা দিয়েছে। আজ সে সিংহাসনের অধিকারী। সব বাধা দূরীভূত। বিক্রমজিৎ বনবীরের চক্রান্তে নিহত। বিক্রমজিতের অত্যাচারে প্রজারা বরাবরই তটস্থ হয়ে থেকেছে তার মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত হয়েছে নগরবাসী। উদয়কে ফিরিয়ে এনেছে, সঙ্গে এনেছে ধাত্রী পান্নাকেও। চিতোরে ফিরে এসেছে সুশাসন। প্রতিষ্ঠা হয়েছে শান্তি। তবু দুর্যোগ পুরোপুরি কাটেনি।

আজ দেশের শাসনভার উদয়সিংহের হাতে। মীরাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। নগরবাসীর ধারণা এতদিন ধরে যে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে মীরার উপর—তারই ফলে চিতোরের আজ ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

মীরা হাসল। বড় দেরী হয়ে গেছে। ওরা কি জানে মীরা আজ সর্বত্যাগিণী সন্ন্যাসিনী। চিতোরের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত মানসিকতা আজ আর তার নেই। বাঁশির সুর শুনেছে মীরা, শুনেছে তার পদধ্বনি। সে আসছে। কেউ ডাক দেয়—মীরা শোনে—সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না—কষ্ট পায়, যন্ত্রণা পায়, তবু হারিয়ে যেতে পারে না। সময়ের বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। মহাকালের শিকল আপনিই খসে যায় সময় হলে—তখনইতো চিরমুক্তি। সে সময় আগতপ্রায়।

মীরা রাজপুত রমনী। মেড়তা কন্যা। মালদেব তখন মেড়তা অধিকার করে নিয়েছে। জ্যেঠামশাই ও তার পুত্র জয়মাল নিরুদ্দেশ। এই দুর্দিনে বিক্রমজিত মীরাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল। এমনিতেই উদয়কে সরানোর মূলে যে তারই হাত ছিল সেকথা অনুমান করেছে বনবীর। বিক্রমজিতও জেনেছে। ওদের ধারনা রাজনীতিতে মীরা কিছু কম যায় না। সাধনার কথা মুখে বলে আসলে নিজের দলভারী করতে চায় সে। অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্ষেপে উঠল বিক্রমজিত। নিজের বোন উদাবাঈকে মীরার গোপন সংবাদ আনয়নে নিয়োগ করল। কারমেতনবাঈ কিন্তু মীরাকে বুঝেছিলেন তাঁর কোন সায় ছিল না। কিন্তু বনবীরের পরামর্শে বিক্রমজিত তখন উন্মাদপ্রায়। ন্যায় অন্যায় কোন বোধই তার নেই। মায়ের কথা সে শোনেনি। উদাবাঈকে মীরার সঙ্গে সঙ্গে রাখা হলো। মীরা তখন এসব বোঝেনি, বুঝেছে অনেকে পরে। হেসেছে।

উদাবাঈ অনেকবার বোঝাতে চেয়েছে। বলেছে "তুমি রাজপুত রমণী চিতোর কুলবধূ—তোমার আলাদা সম্মান আছে সেকথা ভুলে যাও কেন?" এসব গান-নাচ সাধু সন্তদের সংসর্গ ত্যাগ করে অন্তঃপুরবাসিনী হলে মর্যাদা পাবে।"

মীরা কোনো কথা বলেনি। আপন মনেই গান বেঁধেছে—

মোহি লাগী লগন গুরু চরনন কী।
চরণ বিনা কছুয়ৈ নহি ভাবৈ জগমায়া।
সব সপনন কী।
ভবসাগর সব সুখি গয়ো হৈ
ফিকর নহীমোর তরনন কী,
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
আসয়হী গুরু সরননকী।

গান শুনে উদাও কেঁদেছে। ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছে তার দেহমন। অনুভব করেছে মীরা সাক্ষাৎ দেবী। দোটানায় পড়ে যন্ত্রণা পেয়েছে উদা। একদিকে দাদা বিক্রমজিত অপরদিকে মীরা। মীরার কাছে আসলেই অন্যরকম অনুভূতি জাগে তার। নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা দূর হয়ে যায়। ওদিকে বিক্রমজিত ক্রমাগত তাড়া দিয়ে চলেছে। মীরাকে বিপদে ফেলতে চায় সে, উদা মধ্যস্থতা করে কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছে। উদা বোঝে মীরা রাজনীতিতে অংশ নিতে চায়না, তাব পথ ত্যাগের পথ ভালবাসার পথ। কিন্তু বিক্রমজিত বোঝেনা। ওদিকে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। উদা কোন খবর দিতে অপারগ। বিক্রমজিত বণবীরকে ডেকে পাঠান। বণবীর এতদিন ধরে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। মীরাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার মতলব তার অনেকদিনের। বণবীরের পরামর্শ শুনে দুদণ্ড থমকে গিয়েছিল বিক্রমজিত। অনেক-চিন্তার পর অবশ্য রাজী হয়েছিল। বণবীর বুঝিয়েছিল কাঁটা সরিয়ে ফেলা দরকার।

মীরারও তখন ভাল লাগছে না। চিতোরেব অবস্থা ও ভাল নয়। এমন কোন মানুষ নেই যাকে সব কথা খুলে বলা যায়। শুধু রাজনীতি আর রাজনীতি। দুদণ্ড ঈশ্বরের কথাও বলার মত সুযোগ নেই। মন্দিরে এখন আর তেমন লোকজন আসে না। বিক্রমজিতকে সকলে ভয় করে—আগের মত তেমন করে প্রতি সন্ধ্যায় আর আসর বসেনা। মন্দির প্রাঙ্গন ভরে ওঠেনা কীর্ত্তনের সুরে—বড় ফাঁকা লাগে সব কিছু। মীরা ভাবে সেতো কিছু চায়নি। নিভৃতে নিরজনে শুধু সেই প্রাণপ্রিয়র সঙ্গে সময় অতিবাহিত করা এই ছিল তার বাসনা—তাতেও এত বাধা। চিতোরের আকাশে ষড়যন্ত্রের বিষ বাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। মহলে গুপ্তচরের আনাগোনা। সকলেরই চোখে সন্দেহ তাকে নিয়ে। আপনজন বলতে আজ তার আর কেউ নেই।

খবর এসেছিল। বিষ প্রয়োগে হত্যার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিক্রমজিত। মীরা বিস্মিত হয়নি। এখন শুধু অপেক্ষা। গিরিধারীর চরণে নিজেকে নিবেদন করেছে মীরা। এই তো পরীক্ষার সময়—

মীরা অপেক্ষামান। ভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের অনেক বাধাই অপসারিত হয়েছে। অবশিষ্ট যেটুকু আছে সেটুকুও দূর করার জন্য মীরা স্থির নিশ্চল। ধীরস্থির হয়ে অপেক্ষা করে, যাতে আরো আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়—মিলন হয় আরও সুসম্পূর্ণ। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটির অসংখ্য বন্ধনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত ব্যবহারিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তার হৃদয়। তার সাধনায়

পৃথিবী এগিয়ে চলেছে রূপান্তরের দিকে। তার দুঃখের দিনের আকুল প্রার্থনার উত্তরে গিরিধারী আশ্বাস দিয়েছেন। মীরা শুনেছে তাঁর পরম দয়িতের বাণী, তার অন্তরের সূক্ষ্ম চেতনায়। তিনি বলেন—মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই রয়েছি—কষ্ট পেয়ো না। তোমার প্রতিটি চেষ্টা. প্রত্যেক ব্যথা, প্রত্যেক আনন্দ এবং যন্ত্রণা, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান, আকাঙ্খা, সুন্দর, মলিন—সকলে মিলে তোমায় নিয়ে চলেছে আমারই দ্বারে—আমি অন্তহীন শান্তি পারাবার—বিরহহীন চিরমিলন ছায়াহীণ আলো—পরমাশীর্বাদ।

মীরার সাধনা এখন তুঙ্গে। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তপস্যার স্রোত। দিব্য উপলব্ধিতে সে ভরপুর। ওরা জানেনা। অসীম অনন্ত বিশালতা এখন তার চেতনায়। মীরা চায় সকল মানুষের কল্যাণ। সকলের চেতনার রূপান্তর। নব-জীবনের অভিষেক। সে তার পরম দয়িতের উদ্দেশে প্রশস্তি করে গায়—

ভজন ভরোসে অবিনাশী,
মৈ তো ভজন ভরোসে অবিনাসী।
জপ তপ তীর্থ কছুয় না জানু,
করত মে উদাসীরে—।
মন্ত্র ন জন্ত্র কছু এ না জানু
বেদ পড়্থী ন গহকাশী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
চরণ কমলকী হুঁ দাসী।

হে প্রভু, শুধু ভজন ভরসাতেই এখনো বেঁচে আছি। আমি জপ তপ তীর্থযাত্রা কিছুই জানিনা। হে প্রভু আমাকে উদাসী কর। আমি মন্ত্র জানিনা, বেদ পাঠও করিনি, কাশীও যাইনি। ওগো মীরার প্রভু গিরিধর নাগর—আমি তোমার চরণ কমলের দাসী।

ভোরের স্নিগ্ধ সকালে সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ল। বণবীরের পরি-কল্পনার কথা আগেই জেনেছিল মীরা। কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর পথ খোঁজেনি। এ দেহ নশ্বর। দেহের প্রতি কোন মায়া নেই তার। এ সংসারে কে কার? গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাভবিতা বানভূয়ঃ
অজোনিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।
বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি
সংযাতি নবানি দেহী

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতিপাবক
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত
অচ্ছেদ্যোহয়ম দাহ্যোজম ক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যাণি ভারত
অব্যক্তানিধনান্যেব তত্রকা পরিবেদনা।

যে আত্মাকে জেনেছে তার আর কিসের ভয়? মীরার চেতনার দিগবলয় ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে নিশ্চয় থেকে আরও নিশ্চয়তার দিকে। গিরিধারীর কাছে গভীর ভক্তি আর অসীম নির্ভরতা নিয়ে সনির্বন্ধ ভিক্ষা চায় সে—ওগো প্রভু, অজ্ঞান, অন্ধকার দূর কর—অন্ধকার যেন তোমার আশীর্বাদের আলোকে আলোকিত হয়, তোমার বিধান যেন ঘোষিত হয় দিকে দিকে। তোমাব সঙ্গে চিরমিলনের পথ সুগম করে তোলো। আশ্রয় দাও সকলকে, সকলে যেন একসঙ্গে তোমার দিকে দুহাত প্রসারিত করে এগিয়ে যায় তোমাবই সঙ্গে একাত্ম হতে। মনকে অন্তর্মুখী করে তোমার কাছে যেন তারা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারে—'আমি' যেন লুপ্ত হয়ে যাই 'তুমি'তে।

মীরার চেতনা এখন কৃষ্ণ চেতনায় বিলীন। তার 'আমি' চলে গিয়েছে। তার বদলে এসেছে ঈশ্বরের পূর্ণ চেতনা। সবই তার কাছে সুন্দর, সবই প্রশান্ত, সবই তোমাতে পরিপূর্ণ দীপ্ত সূর্যের মতোই ভাস্বর। তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে এখন শুধুই আনন্দ ছন্দ বহমান। দয়ারাম পাণ্ডে এসেছে। মীরাবাঈ তারই প্রতীক্ষায় বসেছিল এতক্ষণ। সে জানে চরণামৃত বলে বিষ এনেছে দয়ারাম। মীরাকে এখন শ্রদ্ধা করে উদাবাঈ। দাদাব এই অন্যায় সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। দুহাত ধরে অনুনয় করেছে এ বিষ যেন সে পান না করে। কিন্তু মীরা শোনেনি। সারা বিশ্বজুড়ে এখন শুধু তাকেই অনুভব করছে মীরা—সামান্য বিষে তার ভয় কি?

দয়ারামের আনা চরণামৃত দুহাত পেতে গ্রহণ করে—নিঃশেষে পান করেছিল। উদাবাঈ সেদিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল মীরা। আপনমনে গান ধরেছিল—

বিষকী প্যালো রানাজী মেল্যো,
দ্যো মেড়তনীনে পায়
কর চরণামৃতপী গইরে,
গুণ গোবিন্দ রা গায়॥
পিয়া পিয়ালা নাম কারে,
আউর ন রংগ সোহায়—
মীরা কহৈ প্রভু গিরিধর নাগর
কাচো রংগ উড়জায়।

বিষের পেয়ালা রানাজী পাঠিয়েছেন। গোবিন্দের নাম করে চরণামৃতরূপে

তা পান করেছি। আমার কাছে এখন আর কোনো কিছুই শোভা পায়না। মীরা বলছে হে গিরিধর নাগর—অনিত্য সব ধ্বংস হয়ে যাক্।

উদা অবাক, বিস্মিত। বিস্মিত আরো অনেকেই। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে মীরা—বিষ তার কাছে অমৃত হয়ে গেছে। নগরবাসী মীরার সাধনায় অভিভূত। পরদিন ভোর হতে না হতেই জনে জনে ছুটে এসেছে মীরাকে দর্শন করতে। মীরার সেদিকে জ্ঞান নেই। নিজে ভাববিভোরা। সমস্ত শরীর দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মীরা সুস্থ। কিন্তু খবর এসেছে দ্বারকার রণছোড়জী বিগ্রহের মুখ থেকে বিষাক্ত ফেনা নির্গত হচ্ছে। খবর পেঁীছেছে বিক্রমজিতের কাছেও। বণবীর এবং বিক্রমজিত দুজনেই অবাক। কি করবে ভেবে পায়নি। তাদের ছলচাতুরী কার্যকর হলনা। বণবীর এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সে নতুন ফন্দী আঁটতে লাগল। তীব্র বিষেও মীরার যখন কিছু হয়নি তখন এমন কিছু করতে হবে যা থেকে নিস্তার নেই।

ওদিকে উদাবাঈ মীরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। সে এখন সারাদিন তার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কথায় বলে পরশমণির স্পর্শে কাঁচও কাঞ্চন হয়ে যায়। উদারও তাই হয়েছে। মীরার সঙ্গে থেকে সে এখন শত্রুতা ভুলেছে। আসন্ন সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গনে মীরা সেদিন গাইছিল—

জবতে মোহি নন্দ নন্দন দৃটি পয়োমাই
কহা কহো সুন্দরতাই বরনিজু নহি জাই।
কুন্তল কী ঝলকানি কপোলন পরছাই
মন হু মীন সরবর ত্যজি মকর মিলন আই।
ভ্রুকুটি কুটিল চপল নৈন চিতয়ন মে কৌনা
খংজন ঔ মধুপ মীন ভুলে মৃগছৌনা ॥
অধর সধর মধুর সখী মন্দ মন্দ হাসী
দসন দমক দামিনি দ্যুতি চমকত চপলাসী ॥
চারু চিবুক নাসিকা সুক গ্রীব তীন রেখা।
নটবর প্রভু ভেষ ধরে রূপ জগ বিসেখা ॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা অনুপ নূপুর অতি যুহাই
গিরিধর প্রভু অংগ অংগ মীরা বলি জাই ॥

যখন নন্দ নন্দনের ওপর দৃষ্টি পড়ল তার সৌন্দর্যের বর্ণনা করি। যখন কানের কুন্তলের ছায়া গালের ওপর এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন মীন সরোবর ত্যাগ করে মকরের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছে। তার ভ্রুকুটি কুটিল চপল আঁখি চিত্ত হরণ করে। তার দৃষ্টিতে খঞ্জন মধুপান ভোলে মীন ও মৃগ আপন সন্তানকে ভুলে যায়। তার ওষ্ঠ দুটি মধুর। হাসি অতীব সুন্দর। সুন্দর দাঁতগুলিতে বিদ্যুতের চমক। গন্ডদ্বয় সুন্দর। ধারালো নাসিকা—গলায় তিনটি রেখা। নটবর প্রভু এক এক জগতে এক এক বিশেষ রূপ ধারণ করেন। কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা চরণে অনুপ

নূপুর শোভা পাচ্ছে। মীরা গিরিধরের প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করছে।

সে গান শুনে উদা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মীরাকে গ্রহণ করেছিল গুরুরূপে। সবকিছু ত্যাগ করে মীরার শ্রীচরণ দুখানি আশ্রয় করে পড়ে রইল উদাবাঈ। গোবিন্দকে মনপ্রাণ সমর্পণ করল। বড় ভাল মেয়ে ছিল উদা। মীরা ভাবে। সহজতা ছিল, বিশ্বাস ছিল। অসুর বংশে সবাই অসুর হয়না। বিক্রমজিতেরই বোন উদা, তবু কত তফাৎ দুজনায়। বড় সাধ জেগেছিল উদার একবার গোবিন্দজীকে দর্শন করার। মীরা খুব স্নেহ করত উদাকে। তার আকুলতা দেখে সেদিন চম্পা চামেলী দুই সহচরীকে গিরিধারীর ভোগারতির আয়োজন করতে বলে নিজে ভজন গাইতে শুরু করেছিল সে। রাত ক্রমশঃ গভীর হয়েছে। অর্ধেক রাত্রে দর্শন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর—চম্পা-চামেলী উদাবাঈ সে দর্শনে অভিভূত। সকলের সামনে বসে প্রভু মীরার সঙ্গে ভোজন করেছেন। মীরা তখন ভাবে বিভোর। আত্ম সমাহিত।

তখনও বিপদ কাটেনি। একদিন ভোরে মন্দিরের দরজা খুলতেই নজরে পড়ল একটা বিরাট ঝুড়ি। ফুলমালায় সজ্জিত। রাণা পাঠিয়েছেন। মীরা আনন্দিতা। রাণা গোবিন্দের জন্য মালা পাঠাবেন এতো ভাবাই যায়না। তবে কি রাণার সুমতি হল? ঈশ্বর কি এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন? মীরা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছু বুঝতে পারে না। উদাবাঈয়ের মনে কিন্তু সন্দেহ দানা বেঁধেছিল। বিক্রমজিতকে সে চেনে। এত সহজে সবকিছু সে মেনে নেবেনা। সন্দেহবশে ঝুড়িটিতে একটু নাড়া দেয় উদা। সঙ্গে সঙ্গেই ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসে বিষধর কালসর্প। ফনা তুলে দাঁড়ায় মীরার সামনে। মীরা কিন্তু ভাবলেশহীণ। সে যেন শ্যামসুন্দরকেই প্রত্যক্ষ করছে এমনই তার ভাব। ধ্যানমগ্ন হল মীরা। দু চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুবারি। তার দৃষ্টির সামনে খেলা করে বেড়াচ্ছে নওলকিশোর শ্যামলবরণ মনোহরণকারী। সে অমৃত পারাবারে ডুবে গেছে। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটার পর ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল মীরার। সামনে তো নেই সেই ভয়ানক সর্প। তার বদলে ঝুড়িতে রয়েছে কয়েকটি শালগ্রাম শিলা। সর্পগুলি শালগ্রামে পরিণত হয়েছে। তাতে সুগন্ধি ফুলমালা জড়ানো।

প্রজারা ধন্য ধন্য করছে। সকলেই বুঝেছে মীরার সাধনা বিফলে যায়নি। মীরা দেবী। শুধু বোঝেনা একজন সে বিক্রমজিত। সদাই জাল ফেলার চেষ্টা তার। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন।

মীরার মন আর বসছে না। কেবলই বৃন্দাবনের কথা মনে হয়। বৃন্দাবন তাকে ডাকে। আর নয় এবার বেরিয়ে পড়বে সে। চিতোরের রাণা পরিবারে অভিশাপ লেগেছে।

প্রজারা রাজী নয়। মীরা চলে গেলে চিতোর শূন্য হয়ে যাবে। অত্যাচারী রাজার শাসনে এমনিতেই তারা সদা শঙ্কিত। এরপর মীরা চলে গেলে কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে তারা। কিন্তু মীরা মানে না। গানে গানে বলে—

মেরে রাণাজী, মৈ গোবিন্দ গুন গানা—।
রাজা রুঠৈ নগরী রাখৈ হরি রুঠ্যা কহ্‌ঁ জানা ।।
রানৈ ভেজ্যা জহর পিয়ালা অমৃত কহিপীজায় ।
ডরিয়া মে কালা নাগ ভেজ্যা—
সালগরাম করি জানা ।।
মীরাবাঈ প্রেম দিয়ানী সাঁঙলিয়া বর পানা ।

ওহে রাণাজী- আমি গোবিন্দের গুন গাই। রাজা রুষ্ট হলে নগরে থাকতে পাব না কিন্তু হরি রুষ্ট হলে কোথায় যাব? রাণাজী বিষের পেয়ালা পাঠিয়েছিলেন। অমৃত জেনে তা আমি গ্রহণ করেছি—ঝুড়িতে বিষধর কালসর্প পাঠিয়েছিলেন আমি শালগ্রামরূপে তাকে গ্রহণ করেছি। মীরা শ্যামলিয়ার প্রেমপাগল হয়ে আছে।

মীরা গানে বিভোরা। সারা নগরবাসীর চোখে জল। সাধু সন্ত অমৃতধারায় সিঞ্চন করছে। ভাব অমৃত। এ রসের আস্বাদন মীরাই দিতে পেরেছে আর কেউ পারেনি। এমন করে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হতে আগে শেখায়নি কেউ। এ অন্য সাধনা অন্য অনুভূতি।

দিন কাটে। বিক্রমজিত অপমানিত বোধ করে। এত চেষ্টাতেও কিছু করা যাচ্ছেনা। এ অসহ্য। যেভাবেই হোক মীরাকে প্রাণে মারতেই হবে। জিদ চেপে যায় বিক্রমজিতের। মীরা অনুরাগীরা মীরার কাছেও খবর এসেছে। সকলে শঙ্কিত। বিক্রমজিতকে চেনে সকলে। কাজ হাসিল করতে তার জুড়ি নেই—ওদিকে বণবীর সহায়। মীরা কিন্তু আগের মতই ভাবলেশহীন। আসর বসে। আগের মত উৎসাহ নেই প্রজাদের। ভয় পায়। মীরা অত্যাচারিতা হবে এই আশঙ্কাতেই অনুরাগীরা শঙ্কিত। তাদের যা হয় হোক কিন্তু মীরাকে কষ্ট দিলে তারা সহ্য করবে কেমন করে?

এবার নতুন উপায় বার করল বণবীর। বিক্রমজিতের নাম করে শূলবিছানা পাঠিয়ে দিল একদিন। মীরা এখন মন্দিরেই থাকে। মাটিতে শোয়। তাই রাণাজী শ্রদ্ধাসহকারে পালঙ্ক পাঠিয়েছেন মীরাবাঈয়ের জন্য, দূত একথাই বলে গেল। পালঙ্কের নামে মীরা জানে ফুলের আস্তরণের নিচে কাঁটা আছে। তখন গভীর রাত। বাহকেরা ফিরে গেছে। মীরা আগের কথা স্মরণ করে আপনমনেই মৃদু হাসল। কাউকে কিছু জানালো না, গিরিধারীর যা ইচ্ছা তাই হোক। পরম নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিল মীরা পালঙ্কের ওপর। ঘুমিয়ে পড়ল সহজেই। কেউ কিছু জানে না। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে রাতের কথা মনে এল মীরার। কিন্তু কাঁটা কোথায়? সমস্ত কাঁটা অপসারিত হয়েছে। তার বদলে শুধু ফুল আর ফুল। ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে সে। দুহাত তুলে শ্যামসুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল সে। কৃতজ্ঞতায় চিত্ত ভরে এল। শূলশয্যা ফুলশয্যায় পরিণত হয়েছে জেনে বিক্রমজিত সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারেনা। তবে কি কোন দৈবী শক্তি ভর করেছে মীরাকে? এবার

সে নিজে যাবে—দেখে আসবে আসল রহস্যটা কি? কাউকে কিছু জানায়নি বিক্রমজিত। বনবীরকেও না। তবে কি সে ভুল করে চলেছে? মীরা কি সত্যিই কৃষ্ণ সেবিকা? আগাগোড়া তাকে ভুল বুঝেছে সে? মনের মধ্যে দুর্বলতা এসেছে বিক্রমজিতের। কেবলই মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হচ্ছে, তার বিচারে ভুল। এবার নিজে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসবে—বড় ইচ্ছা করছে—

কিন্তু গিরিধারীর ইচ্ছা অন্য। এত সহজে মীরার পথ কণ্টকমুক্ত হতে তিনি দেবেন না। মীরা তাকে ভালবাসে। আরো অনেক পরীক্ষা। বাকি এখনও অনেক পথ।

মীরা গায়—

শূল সেজ রানাণে ভেজী
দীজ্যো মীরা সুলায়—।
সাঁজ ভই মীরা সোয়ন লাগী
মানো ফুল বিছায়
মীরাকে প্রভু সদা সহাই
রাখে বিঘণ হটায়।
ভক্তি ভাব মে মস্ত ডোলতী
গিরিধর পৈ বলি জায়॥

মীরার জন্য রাণাজী শূল বিছানা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যায় সেটি ফুল বিছানায় পরিণত হয়েছে। মীরার প্রভু সদাই মীরার সহায়, তিনি সকল বিঘ্ন হতে রক্ষা করেন। গিরিধরকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

এগিয়ে চলেছে মীরা। সামনে অসীম শান্তি পারাবার। বহু কষ্ট বহু পরীক্ষা শুধু যেতে হবে থেমে গেলে চলবে না। সম্প্রদায়গত বিভেদ মীরা মানেনা। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে বলেছেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না। চন্দ্র তারকাও প্রকাশ করেনা। বিদ্যুতও প্রকাশ করতে পারেনা। অগ্নি তাহাকে কিভাবে প্রকাশ করবে?—তিনি নিজে প্রকাশমান বলেই সমস্ত বস্তু সেই দীপ্তিতে দীপ্তমান হয়।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

হৃদয় থেকে নিষ্ক্রান্ত একশ একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হয়েছে। উৎক্রমনকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করেই সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণই সংসারগতির কারণ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোঽন্তরাত্মা সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদি বেষীকাং ধৈর্যেন।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তরাত্মা সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। মুঞ্জ ঘাস থেকে শীষের মততাকে নিজ শরীর থেকে ধৈর্যের সঙ্গে পৃথক করবে। এই ভাবেই তাকে শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ বলে জানতে পারবে।

প্রশ্নোপনিষদে অশ্বলপুত্র কৌসল্য যখন প্রশ্ন করলেন হে ভগবান কোথা থেকে এই প্রাণ জন্মলাভ করেন? কি কারণেই বা এই শরীরে আগমন করেন? কিরূপেই বা অবস্থান করেন এবং কিরূপেই বা উৎক্রমণ করেন?

তখন ভগবান পিপ্পলাদ বলেছিলেন—

পরমেশ্বর থেকেই এই প্রাণ জন্ম নেন। ইচ্ছাদিকৃত কর্মানুসারে শরীরে আগমন করেন। মুখ্য প্রাণ অপর প্রাণদিগকে নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত করেন। গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে—অপানবায়ু নিযুক্ত হয়। অপান ও প্রাণের মধ্যে সমান জঠরাগ্নিতে খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে সমতা প্রাপ্ত করায়। মুখ ও নাসিকামার্গে গমনকারী স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করে। জঠরাগ্নি থেকে সাতটি শিখা নির্গত হয়—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিষয় প্রকাশ হয়।

হৃদয়াকাশে লিঙ্গাত্মা বাস করেন। হৃদয়ে একশত এক প্রধান শিরা আছে। তাদের প্রত্যেকের আবার একশত শাখারূপ ভাগকরা আছে। প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখায় বিভক্ত। এই নাড়ীগুলিতে ব্যানবায়ু বিচরণ করে।

সুষুম্না নামক নাড়ী অবলম্বন করে উদানবায়ু উর্ধ্বগামী হয়ে জীবকে ফলভোগ করায়।

পঞ্চপ্রাণ আত্মা থেকে জাত, প্রাণ, অপান সমান উদান ও ব্যান। প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে, অপান পায়ু ও উপস্থে, সমান নাভিতে, ব্যানকে নাড়ীসমূহে এবং উদানকে সুষুম্না মধ্যে স্থাপন করা এই মুখ্য প্রাণেরই কাজ।

অব্যক্ত ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছাতেই ব্যক্ত হন। মস্তক তাঁর দ্যুলোক, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর চক্ষু। কর্ণ দিকসমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদরাজি, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং তার চরণ থেকে পৃথিবী জাত হয়—তিনিই অন্তরাত্মা। পরম পুরুষ থেকে সেই দ্যুলোক জাত হয় যার ইন্ধন সূর্য। চন্দ্র থেকে মেঘ। মেঘ থেকে পৃথিবীতে ঔষধ সমূহ এবং রেতঃ উৎপন্ন হয়। এইভাবে পুরুষ নারীর মিলনে প্রাণী সমুৎপন্ন হয়। এই এক অখণ্ড ব্রহ্ম থেকেই সমুদ্র সকল ও পর্বতাদি উদ্ভূত। এর থেকেই সেই মধুরাদি রস উদ্ভূত হয়। কারণ অন্ন ছাড়া লিঙ্গশরীর স্থূলশরীরে বাস করতে পারেনা। যার ফলে সূক্ষ্ম শরীর স্থূলশরীরে অবস্থান করে। অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড, ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ নামে কিছুই নেই। ব্রহ্মজাত হলেই সকল বস্তুই ব্রহ্মময় কৃষ্ণস্বরূপ।

মীরার আধ্যাত্মবাদ সকলে বোঝে না। না বুঝুক ক্ষতি নেই। ওরা মীরার

ভালবাসা চায়। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীরাকে খোঁজে, মীরা জানে। ভাবসাধনার পথিকৃৎ সে। সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলাই তার ধর্ম। যে যেমন ভাবে পেতে চায় তাকে সেভাবেই বোঝায় সে। সহজ ভাষায় সরল করে। রাসলীলার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব না বুঝলেও পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণকে খোঁজে সকলে। সে যে বড় আপনার জন ঘরের লোক। তাকে ভালবাসা সহজ। এমনিভাবে মীরাও তো একদিন ভালবেসেছিল নিজের মত করে। ঈশ্বর বোধে নয়। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে নয়। সে তো সাড়া দিয়েছে। ফিরিয়ে দেয়নি। রাসলীলা শুনতে বহু লোক সমাগম হয়—

রাসলীলা বড় সুন্দর। আনন্দময়ের লীলা বৈচিত্রী উপলব্ধির বিষয় পরম সুখময়। রসতত্ত্ব আস্বাদনে সম্প্রদায়গত বিভেদ নেই, তাই নেই কলহের অবকাশ। সেই মধুররসে স্বকীয়া পরকীয়া বলে দুটি বিভাগ আছে। রসবিচারে ভক্তিভাব পাঁচপ্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী সাধনপথ বেছে নেন। যারা শান্তরসের অধিকারী তারা ব্রহ্মপরমাত্মধাম যারা সাম্যরসের অধিকারী তারা ঐশ্বর্যগত বৈকুণ্ঠধাম, যারা শুদ্ধসখ্য বাৎসল্য এবং মধুররসের অধিকারী তারা গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসংহিতা কোন কোন স্থলে চিৎশক্তি অবলম্বন পূর্বক ভগবৎলীলার কথা বলেন।

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলাক এব নিবসত্য খিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

আনন্দ চিন্ময় রস কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি কলা-যুক্তা হ্লাদিনী শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সঙ্গে যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলকধামে বাস করেন সেই আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি। শক্তি ও শক্তিমান একাত্মা হয়েও হ্লাদিনী শক্তিকর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক পৃথক ভাবে নিত্য অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হ্লাদিনী)ও চিৎ (কৃষ্ণ) উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গার রস বর্তমান। সেই রসের বিভাব দু রকম—আলম্বন ও উদ্দীপন।

আলম্বন দ্বিবিধ—আশ্রয় ও বিষয়।

আশ্রয় হলেন—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায় ব্যূহ্যগন এবং বিষয় হলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ। তাদের সঙ্গেই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্য লীলা। গোলোকে সর্বদা স্বীয় অনন্তলীলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ শোভা পাচ্ছেন। যে সকল লীলা প্রপঞ্চগোচর হয় তাই প্রকট লীলা। সেইভাবে কৃষ্ণের সব লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে আছে গোলোকে। প্রকট লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে মথুরায় ও দ্বারকায় অবস্থান। যে সব লীলা ঐ তিনটি স্থানে অপ্রকট তা বৃন্দাবনে প্রকট হয়ে থাকে।

মীরা এমনিভাবেই বোঝায়। প্রজারা শোনে। ভাববিভোরা মীরার তখন অন্য

রূপ—অন্য অভিব্যক্তি। আনন্দরস চুঁইয়ে পড়ে তার সমস্ত সত্তা বেয়ে।

সেদিন আলোচনা সভা শেষে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেছে সবে—এমন সময় বিক্রমজিতের উপস্থিতি। মীরা জানত না। আপন মনেই শ্যামসুন্দরের সঙ্গে আলাপ করছিল সে। গিরিধারী এখন রোজই আসেন। কথা বলেন মীরার সঙ্গে। সাধনার এ এক স্তর। নিত্যই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে মীরা। কিন্তু ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর। দ্বাররুদ্ধ। বিক্রমজিত এসেছিল মীরার কাছে নিঃসংশয় হতে কিন্তু সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়ে চেপে বসল। এই রাতে কার সঙ্গে কথা বলছে সে? গভীর রাতে মীরার ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর—বিক্রমজিত আর সহ্য করতে পারেনা। সাধনার গুপ্তরহস্য তার জানার কথা নয়—সে চেষ্টাও সে করেনি। ফিরে গিয়ে কৈফিয়ৎ দাবী করেছিল। যোগ্য উত্তর চাই নইলে শাস্তি পেতে হবে মীরাকে। মীরা নিশ্চুপ থেকেছে। বিক্রমজিতের মত মহামূর্খকে সাধনা সিদ্ধির স্তর সম্পর্কে বলতে যাওয়ার মত ধৃষ্ঠতা তার নেই। বিক্রমজিত ক্ষান্ত হয়নি। সারা রাজ্য জুড়ে মীরাকে ব্যভিচারিণী বলে প্রচার করেছে—সে যে রাণা পরিবারের অযোগ্য একথা জোর গলায় ঘোষণা করেছে প্রজাদের সামনে। মীরা কিন্তু উত্তেজিত হয়নি একটুকুও। সে জানে এ তার প্রাপ্য। তাছাড়া এ পরিকল্পনা যে বণবীরের সেটুকু বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। মীরা জানে প্রতিনিয়ত তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র চলছিল এতদিন। এবার প্রকাশ্যেই করা হবে। সে সুযোগ পেয়ে গেছে বণবীর। বিক্রমজিত তার হাতের পুতুল মাত্র।

কিছুদিনের মধ্যেই খবর এল বিক্রমজিত এবার বণবীরের সহায়তায় মীরাকে হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর। বন থেকে এক হিংস্র বাঘকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। তিনদিন তাকে অভুক্ত রাখার পর মীরাকে নিয়ে যাওয়া হবে হিংস্র বাঘটির সামনে। মীরা ভাবলেশহীন। বণবীর নিশ্চিত যে এবার আর মীরার বাঁচার কোন আশা নেই। নগরবাসী স্তব্ধ। শোকে মুহ্যমান। নগরের উন্মুক্ত প্রান্তরে মীরা হত্যার আয়োজন সমাপ্ত প্রায়। প্রহরী এসে মীরাকে প্রবেশ করাল খাঁচার ভিতরে। মীরাও দুহাত জড়ো করে প্রণাম জানাল সেই গিরিধারীর উদ্দেশ্যে। উত্তেজনাহীণ শান্ত সমাহিত প্রস্তরমূর্ত্তি যেন। হাত যোড় করে সেই হিংস্র পশুটির দিকে চাইল মীরা—বলল "হে শ্যামসুন্দর আজ তুমি নৃসিংহরূপে দর্শন দিতে এসেছ? মীরার সান্নিধ্যে বাঘটির হিংস্রতা দূরীভূত হল। নতশিরে মীরার কাছে এসে বসে পড়ল সে। মীরা পাদ্য অর্ঘ দ্বারা নৃসিংহরূপে তার পূজা করল। বিক্রমজিত এবার সত্যিই স্তম্ভিত—মীরা বনরাজের কপালে কুমকুমের ফোঁটা পরাল। গলায় ফুলের মালা। পোষা প্রাণীর মত হিংস্র পশুটি গমন করল নিজস্থানে। রাণার চেষ্টা এবারও বিফল হল।

মীরা যে বিপন্মুক্ত সে খবর যথাসময়ে এসে পেঁাছেছে বণবীরের কাছে। বিক্রমজিত হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে বুঝে নিয়েছে এভাবে মীরাকে কিছু করা যাবে না। অগত্যা শরনাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। কিন্তু বনবীর ছাড়বেনা। সে বদ্ধ

পরিকর, মীরাকে সে সরাবেই। যেমন করে হোক। বিক্রমজিত আজকাল কারো সঙ্গে কথা বলেনা। একাই থাকতে চায়। তার মনে পরিবর্তন আসছে। উদা এখন মীরার প্রধানা শিষ্যা। মা কারমেতনবাঈও মীরার পথ বেছে নিয়েছেন। সারা নগরবাসী মীরার গুণমুগ্ধ ভক্ত। বিক্রমজিত ভাবে সকলেই কি ভুল করল? মীরার আসল পরিচয় জানতে চেয়ে কত চেষ্টা বত পরীক্ষাইনা করল সে। সব পরীক্ষাতেই উতরে গেছে মীরা। বিক্রমজিত এবার অসহায় বোধ করছে। এত অপমান সত্ত্বেও মীরাতো তাকে কোনো কটুকথা বলেনি আজও। বরং সব অত্যাচার নীরবে মাথা পেতে সহ্য করেছে। কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি।

বিক্রমজিতের এ মানসিক দুর্বলতার খবর বণবীরের কাছে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগেনি। বিক্রমজিত থেমে গেলে বণবীরের বিপদ। প্রজারা তাকে ছেড়ে দেবেনা। তাই যেমন করেই হোক হাতে রাখতে হবে বিক্রমজিতকে। বিক্রমজিতের কাছে আসে বণবীর। পরামর্শ চালায়। এই শেষবার। চরম পরীক্ষা। এ পরীক্ষাতেও যদি সে উতরে যেতে পারে তবে তাকে দেবী বলে মেনে নেবে সে। এমনই ইঙ্গিত দেয়। বিক্রমজিতের দুর্বলতা অপসারিত হবে।

খবর এসে পৌঁছেছে মীরার কাছে। প্রকাশ্য ঘোষণা। সকলের চোখের সামনে সুরজকুণ্ডের জলে মীরাকে ডুবিয়ে মারা হবে। বণবীর এখন বেপরোয়া। মীরাকে ডুবিয়ে মারলে জনসাধারণের মধ্যে তার যে কী প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা ভালভাবেই জানে বণবীর। দেশবাসীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে বিক্রমজিতের ওপর। বণবীরকে চিনবে না কেউ। এরপর যে বিক্রমজিতও হারিয়ে যাবে সেকথা তার চেয়ে ভাল আর কেউ জানেনা। চিরতরে তাকে সরিয়ে দেবে বণবীর। নিজে ক্ষমতায় বসবে।

লোকের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়ল। রাজকুলবধূ মীরাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হবে। এমন ঘটনার কথা মাথায় আসেনি কারো কোনদিন। সারা নগর জুড়ে থমথমে আবহাওয়া। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানানোর সাহস নেই কারোরই।

সেদিনের কথা মনে হলে আজও অবাক লাগে। এতখানি পরিণত বয়সে পৌঁছেও নিজের সেদিনকার সাহসকে শ্রদ্ধা না করে পারেনা মীরা। সেদিন কারমেতনবাঈ বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করেছিল বিক্রমজিতকে, কিন্তু মার কোন কথা শোনেনি সে। উদার অনুনয়কেও অস্বীকার করেছে। অস্বীকার করেছে সমবেত প্রজার আবেদনকেও।

দিনগুলো কেটে গেছে ঝড়ের মত। এ-কদিন শুধু তাঁকেই ডেকেছে মীরা। অন্য কিছু চিন্তাও করেনি। শুধু সেই চরমক্ষণের অপেক্ষা। সুরজকুণ্ডের চারপাশ লোকে লোকারণ্য।

যথাসময়ে মীরার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অলৌকিকভাবে এবারও রক্ষা পেয়েছে সে। কিছুতেই তাকে ডোবানো সম্ভব হয়নি। এ খবর বিক্রমজিতের কাছেও পৌঁছেছে। জেনেছে বণবীরও। প্রজাদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে

মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে মীরাকে। চিতোরের আকাশে যে বিপর্যয়ের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল তা কেটে গেছে। বিক্রমজিত এই ঘটনার পর কয়েকদিন আর কারো সামনে বার হয়নি। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। মীরাকে নিয়ে প্রজাদের সেদিন কী আনন্দোৎসব। তাদের কাছে সেদিন ছিল বড় আনন্দের দিন। কিন্তু মীরার কাছে সেদিন ছিল বড়ই লাঞ্ছনার। মুখে কাউকে কিছু বলেনি কিন্তু মনে মনে স্থির করে নিয়েছে আর এখানে নয়। বহুদিন ধরেই সে লাঞ্ছিতা। আজ তার অপমান চরমে উঠেছে। আর সওয়া যায়না। অনেকদিন থেকেই শ্রীবৃন্দাবন তাকে টানছে। সবই গিরিধারীলালের ইচ্ছা। এবার সময় উপস্থিত। অবশ্য বৃন্দাবনে যাওয়ার আগে সে একবার মেড়তা ঘুরে যাবে। মেড়তা তার পিতৃস্থান। আর একবার—এই শেষবারের মত পিতৃভূমির মাটি স্পর্শ করে যাত্রা করবে ব্রজভূমির পথে।

তার বৈধব্য জীবনের তেরো বছর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে। তখন ১৫৩৫ খৃঃ। মীরার পাঠানো সংবাদ পেয়ে বীরমদেবজী এসেছেন চিতোরে। মীরাকে মেড়তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৫২৩ খৃঃ গুজরাটের বাহাদুর শাহ চিতোরকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় আক্রমণ চালানো হয় ১৫৩৪ খৃঃ। এবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় চিতোর। তখন বিক্রমজিতের শাসনকাল। মীরার লাঞ্ছনার সময়। এর পরের বছরেই মেড়তায় ফিরে আসে মীরা মেবার ত্যাগ করে।

আজও চিতোরবাসীর সেদিনকার কান্না কান পাতলে শুনতে পায় মীরা। চিতোরের মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আজ অনেক পথ অতিক্রম করে এসেও সেদিনকার মানুষগুলোর আন্তরিকতার কথা ভোলেনি মীরা—ভুলবেও না কোনদিন। চিতোর সেদিন শোকস্তব্ধ। বহু কষ্টে ভক্তবৃন্দের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল মীরা। অনুরাগীদের চোখের জলে সিক্ত চিতোরের পিচ্ছিল পথ বেয়ে মেড়তার পথে রওনা হয়ে গিয়েছিল সে। তখন উষাকাল।

মীরার সারাজীবনই শুধু না পাওয়ার কষ্ট। অনেক আশা নিয়ে মেড়তায় এসেছিল মীরা কিন্তু শান্তি মেলেনি। জ্যেষ্ঠতাত বীরমদেবজীও চেয়েছিলেন মীরার সাধন ভজন প্রাসাদ অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকুক। জনসাধারণের সঙ্গে মিশে সাধারণ মানুষের মত নামগান করা মেড়তা কন্যা, অন্যদিকে চিতোর রাজকুলবধূ মীরার পক্ষে শোভা পায়না। জয়মলও সেই একই কথা বলে। ভাবে মীরা। জয়মল তার জ্যেঠতুতো ভাই। ছোট থেকেই একসঙ্গে মানুষ। তবু মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। দিদিকে কত শ্রদ্ধা করত জয়মল—মীরাও তাকে স্নেহ করত, প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত। অথচ আজ সেই জয়মলও চায় মীরাকে তার পথ থেকে সরিয়ে আনতে। এখানে শারীরিক অত্যাচার নেই কিন্তু মানসিক পীড়ন আছে। নিজ ইচ্ছামত সাধনপথ গ্রহণ করতে না পারা—সে তো অত্যাচারেরই নামান্তর। গভীর রাতে ঘুম আসেনা মীরার চোখে। শান্তি পাওয়া তার হলনা। কে শান্তি দিতে পারে? কোন মানুষই পারেনা। চাইলেও না। মানুষকে ভালবাসলে শুধু

কষ্টই পেতে হয়। মানুষ মানুষকে কিছু দিতে পারেনা। সম্পর্ক পচে একসময় দুর্গন্ধ ছড়ায়। মন আঘাত পেয়ে কাঁদে। অতি আপনজনও পর হয়ে যায়। সম্পর্ক বদলায়। ছোট বেলাকার গভীর সম্পর্কও একসময় অন্য চেহারা নিয়ে ফিরে আসে। সে বুঝি আবেকজন। ভালবাসা থাকে সুপ্ত হয়ে। স্বার্থের পলিমাটির আস্তরণে অনুভূতি যায় হারিয়ে। নিজের জীবন দিয়ে দেখেছে সে—জীবনের প্রতি বাঁকেই অপেক্ষা করেছে কেউ না কেউ যারা তাকে পথ দেখিয়েছে। কখনও শত্রুরূপে, কখনও বন্ধুরূপে। আনন্দে, বেদনায় মাথামাখি হয়েছে হৃদয়। কখনও সুখের সাগরে ভেসেছে কখনও অতলান্ত বেদনায় ডুব দিয়েছে—তবু তো সে হারায়নি। অভিজ্ঞতা তাকে আরও দৃঢ় করেছে সাহস জুগিয়েছে। সবই সেই আনন্দময়ের লীলা। তাঁরই হাত ধরে ঘুরে ফিরে আবার নিজ পথে ফিরে আসতে পেরেছে সে—সেতো ফিরিয়ে দেয়নি। একমাত্র বন্ধু তো সেই। যে কখনও ফেরায় না। কখনও কখনও অভিমান জেগেছিল, মনে হয়েছে সব মিথ্যে—সব কিছু ভুল। বিশ্বাস হারাতে হারাতে একসময় পাগল হয়ে গিয়েছিল, সে এক দুঃসময় গেছে। ভোজরাজ, সংগ্রামসিংহকে হারিয়ে সে যখন দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছিল তখন বিক্রমজিতের অত্যাচার তাকে পৌঁছে দিয়েছিল সহ্যের শেষ সীমা রেখায়। আত্মহত্যা করতে গিয়েও করতে পারেনি। রক্ষা করেছেন গিরিধারী। মীরা অন্তরে তার বাণী শুনেছে। সে বলেছে—"এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি মীরা। এত সহজে হার মানবে তুমি? পরিস্থিতির কাছে পরাজিত হবে? এই কি তোমার ভালবাসা"—জীবন মৃত্যুর সে এক সন্ধিক্ষণ। তবু বেঁচে থাকতে হয়েছে। আরো অনেক সহ্য করে সহ্যতার প্রতিমূর্তি হয়ে জীবনধারণ করতে হয়েছে তাকে। বড় যন্ত্রণা বড় কষ্ট।

বৃন্দাবনে যাওয়ার দিন আগ্রতপ্রায়। মীরার মন এখানেও বসছেনা। মেড়তা তাকে শান্তি দিতে পারেনি। সবসময় বড় অস্থির লাগে। মন টানে। কে যেন ডাকে। যমুনার তীরে শ্যামলিয়া বাঁশি বাজায়। মীরা শোনে। সে তার পূর্বজন্ম দেখতে পায়। একা একা গবাক্ষের ধারে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে পূর্ব জন্মস্মৃতি ফিরে আসে তার চেতনায়।

পুষ্পিত বৃক্ষ শাখায়-প্রশাখায় উড়ে বেড়ানো নানা বর্ণের প্রজাপতির মত তখন জীবন ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। ব্রজভূমির কূজন মুখর পাখির মত শান্তি দিয়ে ঘেরা সে দিনগুলি ছিল মধুময়। অনেক কাহিনী আছে। তখন দ্বাপর যুগ চলছে। চলছে শ্যামলিয়ার লীলা। মীরা তখন বরসানায়। নন্দ গাঁয়ের এক কৃষ্ণসখার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল খুব ছোট বয়সে। নন্দগাঁ—সে তো চতুর চূড়ামণির লীলা-স্থল। সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসে—যুবতী হলেতো কথাই নেই। সেই নন্দনন্দনকে ভালোবাসেনা এমন মেয়ে আছে নাকি ব্রজধামে? কন্যা বিদায়ের আগে মা তাই মেয়েকে কাছে টেনে খুব গোপনে বললেন "শোনো, নন্দগাঁয়ে কৃষ্ণ কানাইয়া নামে এক চতুর চূড়ামণি থাকে তাকে দেখামাত্রই সকলে পাগল হয়। তাই তার কাছ থেকে

সবসময় দূরে থাকবে। কখনও সামনে যাবেনা এবং ভুলেও কখনও ঘোমটা খুলবে না। তার মুখ দেখলেই সর্বনাশ।" কন্যা তখনও কৃষ্ণ কানাইয়াকে চোখে দেখেনি। তাকে সে চেনে না। তাই মা'র কথা শুনে মাথা হেঁট করে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু চতুর চূড়ামণির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কি অতই সহজ? রথ চলেছে। নব বিবাহিত বরকন্যা যখন বরসানা থেকে নন্দগ্রামে পেঁছিবে এমন সময় পথমধ্যে সংকেত নামক স্থানে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত। প্রেম সরোবরের তীরে রথ আটকে দিয়েছে কৃষ্ণ। সখার কাছে নতুন বউয়ের মুখ দেখবে বলে বায়না ধরেছে। কন্যার মুখ তখন ঘোমটায় ঢাকা। তার কাছে এসে মৃদুস্বরে বলেছে—"আমার জন্য কি এনেছ? বধূ মুখখানি একবার দেখাও তো। চক্ষু সার্থক করি।" বধূতো লজ্জায় রাঙা। আরো খানিক ঘোমটা নামিয়ে আধাবদনে থেকেছে। ছি ছি কি লজ্জা? এমন করে কেউ বলে নাকি কখনও? মা'র কথা মনে পড়ে গেছে তার। মার সাবধানবানী স্মরণে এসেছে। ওদিকে কৃষ্ণসখার কোনো সংকোচ নেই। বলেছে "সখা তোমার জন্য তো সর্বত্র অবারিত দ্বার। রথের পরদাখানা তোল বধূর মুখ দেখে নাও। এত দ্বিধা করছ কেন?" শ্যামসুন্দর তো জানেন যে এরপর কি ঘটবে? তাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সখার কথামত ঘোমটা তুলে মুখ দর্শন করতে যাবেন এমন সময় বধূটি বলে বসল তুমি আমার মুখ দেখবে কি? মাথাটা দেখে নাও। বধূটি জানলনা সে কাকে প্রত্যাখ্যান করল। কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত হলেন—রথ থেকে নেমে ফিরে গেলেন নন্দগাঁয়ে। রথ চলতে লাগল।

এ ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। ব্রজমণ্ডলে ভীষণ বর্ষা নেমেছে। ঘন মেঘে সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় চারিদিক অন্ধকার। প্রচণ্ড ঝড়ে বড় বড় গাছ বাড়ি আর পাহাড়ের চুড়াগুলি ভেঙ্গে যেতে লাগল।

ভয়ে ব্রজবাসীরা কাঁপছেন। নন্দ তখন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, "হে কৃষ্ণ তুমিই এখন সবাকার গতি। এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর সকলকে।" কৃষ্ণ তখন সহসা বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করলেন। তারপর এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে মূল থেকে উৎপাটিত করে ছাতার মত করে ধারণ করলেন। বললেন "ব্রজবাসী তোমরা সকলেই এই পর্বতের ছত্রছায়ায় এসে তোমাদের আত্মীয় স্বজন, গৃহপালিত পশুসমেত আশ্রয় গ্রহণ করো।" দশক্রোশ ব্যাপী সেই পর্বতের ছত্রতলে সমস্ত ব্রজপুরী শোভা পেতে লাগল। যারা তার তলায় আশ্রয় নিয়েছিল কেউই ঝড়বৃষ্টির কোন প্রকোপই অনুভব করলেন না। বরসানা থেকে আগত ঐ নববধূকেও তখন প্রাণ রক্ষার্থে ঐ ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। ঐ গিরিগোবর্ধনধারী শ্যামসুন্দরের পীতাম্বর পরিহিত, ময়ূর মুকুট শিরে শোভিত এক হাতে মোহন মুরলী সমেত মনোহরণকারী রূপ দেখে বধূটি তো আত্মহারা। নিজের কৃতকর্মের জন্য সমস্ত অন্তর তার জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা হয়ে বধূটি তখন ভাবছে কাকে মুখ দেখাতে মা নিষেধ করেছিলেন? কি আত্মঘাতিনী শিক্ষা। এমন ভুলও কেউ করে? অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে উঠেছে তার হৃদয়। একি ভুলই না সে করেছে। এখন উপায়? এই শ্যাম

সুন্দরই তো তার মুখ দেখার জন্য কত অনুরোধ করেছিল আর সে এমনই হত-ভাগিনী যে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অপরাধিনী বধূটি তখন করজোড়ে সাশ্রুনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রভুর চরণে আশ্রয় পেতে চাইলে তিনি উত্তব দেন যে দেহ দ্বারা তুমি আমাকে এজন্মে অবহেলা করেছ সে দেহে তুমি আমাকে পাবেনা। অন্য জন্মে অবশ্য তোমার সাধনা সফল হলে আমাকে পাবে।' সেই মীরা। আজ অষ্পষ্ট ছবির মত মনে পড়ে। সেদিন কি ভুলই না করেছিল ব্রজবধূটি যার জন্যে আজও তাকে এমনিভাবে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হচ্ছে—আরো কত অপেক্ষা কে জানে? সে জন্মেব ব্রজবধূটি সেই যে গিরি-ধারীকে ভালবাসল—তারপর থেকে একমুহূর্ত্তের জন্যও তাকে ভোলেনি সে। কত সাধনা, কত তপস্যা কত ঝড় ঝঞ্ঝা পার হয়ে—আজও গিরিধারীর প্রেমে রাঙানো তার হৃদয় পথ। সেই পথেই সে আসবে—বলেছিল। আজ শুধুই অপেক্ষা।

এমন করেই স্মৃতি এসে অনুভূতির দুয়ারে ঘা মারে। মীরা হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝেই বাহ্যিক সত্তা লোপ পায় তাব। আজকাল এখন প্রায়ই হচ্ছে। অন্তর কেবলই বলে—হে গিরিধারী তোমার করুণা ভিক্ষা করতে চাইনা। আমার উদ্দেশ্য হল তোমার দিকে এগিয়ে চলা। একপা একপা করে যেন কোন না কোনো একদিন তোমার কাছে পেঁীছে যেতে পারি। পথ যতই অন্ধকার হোক বাধা যতই দৃঢ় হোক আমার জীবনে যত কষ্টই আসুক না কেন তোমার নির্দেশ আমি মাথা পেতে নেব ঐকান্তিক চির উজ্বল শান্ত প্রেম চেতনায়।

কখনও বলে—'কেন এত কষ্ট দাও আমাকে? কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে? চারদিকে এত অন্ধকার ছেয়ে আছে কেন? এ অগ্নি পরীক্ষা কি কোনদিনই শেষ হবে না?'

মীরার এখন প্রস্তুতিকাল। নিবন্তর গভীরতম সাধনায় ডুবে থাকে মীরা। চেতনার অনন্ত বৈচিত্র নিয়ে মিশে যায় বিশ্ব চেতনায় তাঁরই চরণে বিলীন হতে। বিশ্বা ত্তীতের কাছে আত্ম নিবেদন - পূর্ণ সমর্পণ।

ঠিক এমনিভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিল গোপীরা সেযুগে। কৃষ্ণ জানেন তাকে অদেয় তাদের কিছুই নেই তবু পরীক্ষা করেন, বারে বারে। রাশ পূর্ণিমায় গোপীরা এসেছেন তার কাছে। তারা কেন এসেছে তার কাছে সেকথা ভালভাবেই বোঝেন শ্যামসুন্দর তবু ছলনা করতে ভালবাসেন। অনেক প্রশ্ন করেও যখন গোপীদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলেন না তখন আঘাতের পর আঘাত হানলেন। এমন ভাব করলেন যেন কিছুই বোঝেননি। বললেন তোমরা কেন এসেছ তা যখন বলছ না তখন মনে হয় ব্রজে কোন অমঙ্গল সংগঠিত হয়েছে। ব্রজ গোপিনীরা নিষ্ঠুর শ্যামের কান্ড দেখে মনে মনে বলছেন "ওগো নিষ্ঠুর ব্রজের কোন বিপদ হলে আমরা কেন আসব তোমার কাছে? বিপদ ব্রজে নয় বিপদ আমাদের। এই হতভাগিনীদের। এ বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই আমাদের উদ্ধার করতে পার। কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই আমরা পাব না। কৃষ্ণ তখন

উপদেশ দিচ্ছেন—

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপিবা
পতিঃ স্ত্রীভিন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী

স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ কর্মশক্তিহীণ রোগগ্রস্ত বা ধনহীণ হলেও যদি পাতকী না হন তবে ইহলোক ও পরলোকাকাঙ্ক্ষী নারীদের তিনি পরিত্যজ্য নন।

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ।
শ্রবণাদর্শনাদ্ধ্যানান্মসি ভবোহনুকীর্ত্তনাৎ
ন তথা সন্নিকর্ষেন প্রতিযাত ততো গৃহান্ ।।

উপপতি গ্রহণ কুলস্ত্রীগণের স্বর্গলাভের পক্ষে অন্তরায় অযশের কারণ। পতিই সতীর আরাধ্য। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্ত্তনে আমার প্রতি যেরূপ ভক্তি জন্মায় সঙ্গলাভে তা হয়না। অতএব সময় নষ্ট না করে এখনই গৃহে গমণ কর। মনপ্রাণ অর্পণ করে পতিসেবা কর।

কৃষ্ণর এই উক্তি শুনেও গোপীরা নিশ্চুপ। চিন্তা, উদ্বেগ মহভাবের তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, তবু ভাষা বেরোচ্ছেনা সবটাই অনুভূতি। তাদের কণ্ঠ রূদ্ধ হয়ে গেছে। তারা অন্তরে বলছেন "ওগো নিষ্ঠুর দয়াল প্রাণধন আমরা তোমাকে ছাড়া কিছুই জানিনা। আমাদের অন্তর বাহির সবই তোমাময়। আমাদের পতি তুমিই। আমরা তোমারই সেবা করতে চাই—তুমি যদি আদেশ কর তবেই তারপরে গৃহে ফিরে পতি সেবায় রত হব। তুমি অত কঠিন হয়ে আমাদের চরণছাড়া কোরোনা—আমরা সইতে পারছিনে। তোমার কথায় বুঝলাম প্রাণের অনুমোদনে হৃদয় সাক্ষী করে যাকে ভালবাসলাম সে পতি নয় আর যাকে কোনদিনও ভালবাসতে পারলাম না, স্বপ্নেও যাকে দেখিনা, যার সঙ্গ নিতান্ত পীড়াদায়ক তার সেবায় পতি সেবার পুন্য হবে—এ বড়ই হাস্যকর কথা। ধন্য বিচার তোমার। যদি তাই হয় হোক। ঔপপত্য দোষকেই অঙ্গের আভরণ করেছি। লোকনিন্দায়-ভয় পাইনা। আমরা সতী হতে চাইনা, তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

ব্যাথা ফুটে ওঠে গানের মধ্যে। মীরা গায়—

প্যারে দরশন দীজ্যো আয়—
তুম বিন রহো ন জায়—।
জল বিন কমল, চন্দ বিন রজনী
ঐসে তুম দেখ্যো বিন সজনী,
আকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন,
বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভূখ নীদ নহি রৈনা
মুখসু কথন ন আয়ৈ বৈনা।
কহা কহু কছুত বহত ন আয়ৈ

মিল কর তপত বুঝায় ॥
কঁহু তরসায়ো অন্তরজামী
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী
মীরা দাসী জনম জনমকী
পড়ী তুমহারে পায় ।

প্রিয়ে দরশন দিয়ে যাও। তুমি বিনা থাকা যায় না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা রজনীর মত তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। আকুল ব্যাকুল হয়ে ঘুরি দিনরাত। বিরহজ্বালা অন্তর দগ্ধ করে। দিনে ক্ষিদে নেই, রাতে ঘুম নেই, মুখে কোন কথা আসে না। কত কথা বলার আছে বলা যায় না। কেন কষ্ট দাও ওগো অন্তরযামী—কৃপা করে এসে দেখা দাও ওগো প্রাণস্বামী। মীরা তোমার জনম জনমের দাসী—তোমার পায়ে পড়তে চায় এবার মধুবৃন্দাবনে। মেড়তায় বেশিদিন ভাল লাগেনি মীরার। পরিবেশ পরিস্থিতি তার অনুকূলে ছিল না। সব বাঁধন কাটিয়ে চলে এসেছে বৃন্দাবনে। তার গিরিধারীর কুঞ্জবনে। চিতোর ছেড়ে মেড়তায় চলে আসার আগেই দ্বিতীয়বার আক্রমন চালিয়েছিল বাহাদুর শাহ। তখন বিক্রমজিতের শাসনকাল। সেই যে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে উঠল চিতোরের আকাশে এখনও তা পুরোপুরি কাটেনি। বনবীরের চক্রান্তে প্রাণ হারিয়েছে বিক্রমজিত। রাজনীতিতে অনেক বদল ঘটেছে। মীবাবাঈএর লাঞ্ছনার জন্য দায়ী বিক্রমজিত। তবু কোনদিনও তাকে কটু কথা বলেনি সে কারণ মীরা জানত সবকিছুর মূলে ছিল বনবীর। বিক্রমজিত তার হাতের পুতুল মাত্র। তবু বিক্রমজিতের মৃত্যু সংবাদে কষ্ট পেয়েছে—গিরিধারী-লালের কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করেছে। ক্ষমা পেয়েছে বিক্রমজিত। বৃন্দাবনে এসে আর পিছু ফিরে তাকায় না মীরা। যা হবার হয়ে গেছে। এখন সে পূর্ণসাধিকা। বৃন্দাবনে আসার সময়—অনেক সুখকর ঘটনা তাকে মুগ্ধ করেছে। সুদীর্ঘ পথে শ্রীহরির নামে আকৃষ্ট হয়ে বহুলোক তার সঙ্গ নিয়েছে। মীরা জানে কত অজানা পথের বাঁকে রাখালবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পথ দেখিয়েছেন। মীরা যেখানেই পেঁছেছে—অপূর্ব ভাবাবেগে মেতে উঠেছে সেখানকার মানুষ। কৃষ্ণনামে পাগল হয়েছে। বৃন্দাবনে এসে প্রায়ই ভাবসমাধি ঘটত। সে সময় আপন অস্তিত্ব ভুলে যেত মীরা। ভাবাবেশে শ্যামলিয়ার দর্শন পেত—। সেও আজ অনেক দিনের কথা।

বৃন্দাবনে পেঁছে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে মীরাকে। ব্রজধাম নিত্য-লীলাভূমি। মীরার সাধনা তো সেই লীলাময়ের উদ্দেশেই। তার সাধনার প্রধান অঙ্গই সঙ্গীত। সঙ্গীতের মাধ্যমেই সাধনা করে মীরা। সে জানে, সঙ্গীতই পারে—অনায়াসে মূল কেন্দ্রে পেঁছে দিতে। সঙ্গীতই সাধনার সোপান। ভাবে বিভোর হয়ে—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে সুর ওঠে—সেই তো পেঁছে দেয়—অব্যক্তে। তাই গানকেই সে বেছে নিয়েছে—সঙ্গীতই তাকে শান্তি দেয়। ওরা জানতে চায়। অনেক প্রশ্ন ওদের। সাধনা একান্ত নিজস্ব বস্তু। তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু

সাধারণ মানুষের অনেক কৌতূহল তাকে নিয়ে। যতটা সম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করত যাঁরা। কেউ কেউ উপলব্ধি করে—ভাবের পথে উত্তরণ ঘটে।

সুরই পেঁছে দেয় গন্তব্যে অতি সহজে। ভারতের সঙ্গীতশাস্ত্র আধ্যাত্মশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। বিশেষ সাধনাঙ্গ শাস্ত্র। সেই আদি বিরাট পুরুষের দেহ থেকে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল সাবিত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য। তারপর প্রজাপত্য বা গায়ত্রী অধ্যয়নশীলের ত্রিরাত ব্রত ও উপনয়ণ বিধি। (৩) ব্রাহ্ম—ব্রতধারীর সম্বৎসরের মধ্যে বেদ গ্রহণ। (৪) ছন্দসকল। বেদ আবৃত্তির লক্ষ একদিকে যেমন ছিল সংযম ও প্রজ্ঞা বর্দ্ধন তেমনি সে আবৃত্তিক্রমে—খেলা করত সুরলহরী। তখন সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্তে আনতে হলে ব্রহ্মচর্য অবশ্য পালনীয় ছিল। পবিত্রভাবে জীবন যাপনই ছিল—সঙ্গীত সাধনার প্রধান অঙ্গ। এইভাবে জীবনযাপন করতে করতে সমস্ত জীবনটাই হয়ে উঠত ছন্দময়। অর্থাৎ যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছন্দ হত—সেইভাবেই গড়ে তোলা হত জীবনকে। সে ভাব এখন লুপ্ত। পাওয়া যায় না কোথাও। তবু কিছু অংশ মেলে—তাই থেকেই পরবর্তীযুগের সাধনার পথ সুগম হয়েছে। সে সময় ছন্দের শব্দমাত্রার সংখ্যানুসারে উপনয়ণের বয়স নিরূপিত হত। উপনয়ণ হত দ্বিজের, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। অগ্নি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই ত্রিছন্দ। উপনয়ণের বয়স নিরূপিত হত গায়ত্রী, ত্রিস্ঠুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পঙক্তি, বৃহতী আদি ছন্দানুসারে। পরবর্তীকালে এই ধারা হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে আনুষ্ঠানিক আচার মাত্র। এখন জাতি, বর্ণ বংশগতভাবে প্রচলিত। সে যুগে তা ছিলনা।

সঙ্গীতশাস্ত্রে শ্রুতি ও স্বর নামে দুটি শব্দ আছে। ব্যকরণগত অর্থ বাদ দিয়ে বলা যায় মানুষের শরীরের অন্তর্গত সৃজনকারিণী শক্তি যেটি সেটিই কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে মূলাধারে। তন্ত্রে যাকে সাপ বলা হয়েছে। সাপ ও কুণ্ডলে যে ভেদ স্বর ও শ্রুতিতেও সেইটুকুই তফাৎ। মূলতঃ একই বস্তু—তবু প্রকাশে তফাৎ। রাগ রাগিনীর আলাপ করার সময়—যেসব ধ্বনির সাধ্যমতো প্রয়োগ হয়—তাই স্বরে পরিণত হয়, যেগুলি হয় না সেগুলিকে বলা হয় শ্রুতি। তারের যেসব যন্ত্র আছে তাতে সমবিভক্ত 'শ্রুতি'-র পর্যায় থাকে। শক্তিকে পূর্ণরূপে বুঝতে পারলেই 'বোধ' জন্মায়। প্রত্যেক রাগের এক একটি বৈশিষ্ঠ্য থাকে। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা লক্ষণ আছে। স্বরের জাতি আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। আরোহ অবারোহের মধ্যে দিয়ে রাগের বিকাশ হয়। রাগের চার অংশ। উদগ্রাহ, স্থায়ী, সঞ্চারী ও বিশ্রান্তি। ঐগুলির নামই তান। ভারতীয় ছন্দের মূল ভিত্তিই হল মাত্রা। শক্তির ক্রিয়াকে আমরা ভাগ করি—দুভাবে। একটিকে বলি কাল, অন্যটিকে বলি দিক। প্রত্যেক গানে কাল নিরূপিত হয়—তাল এবং তানের সাহায্যে। অবকাশই ফাঁক। প্রত্যেক গানের নিজস্বরূপ সেই গানের আত্মা'—মানুষের জীবাত্মাস্বরূপ। এবং সুরকেন্দ্রই পরমাত্মা। সব লয় সেখানেই।

কিছু না করা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে বলে অব্যক্ত। সেই অব্যক্তের প্রথম প্রকাশ হয় 'নাদে'। তন্ত্রের মুদ্রা বলতে বোঝায় নাদের অবরোহ ক্রিয়াতে সৃষ্টির বিবর্তন

প্রক্রিয়া, তাকেই বলে রাগ। শব্দবিদ্যার মূলই সঙ্গীত বিদ্যা। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধ্বনিই বেদ। সঙ্গীত বিদ্যা অন্য সব বিদ্যার মত বেদ থেকেই এসেছে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে তবেই 'নাদ'-রহস্য পরিষ্কার হয় সাধকের কাছে। তার আগে নয়। তাই নাদ প্রকাশের জন্য চাই শুদ্ধ আধার। ছন্দময় জীবন।

যে বিশ্বনিয়মে শব্দ আত্মপ্রকাশ করে সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে বৈদিক মাত্রা, গ্রাম এবং তাদের অবরোহ প্রণালীর পরিপূর্ণ যোগ ছিল। কালচক্রের প্রতিবিম্বই শব্দের অবরোহ। ঐ প্রতিবিম্বই সুরকেন্দ্র। আর অবরোহ প্রণালীই সৃষ্টি রহস্য। ঐ সুরকেন্দ্র থেকেই বিশ্ব বিক্ষিপ্ত হয়। মূল থেকে স্বর অনবরত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যজ্ঞ চলেছে। এ যজ্ঞের শুরু বা শেষ নেই। সেই চিরকালীন ছন্দে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আদি পুরুষ প্রকট হন—জীবভাব চলে যায়।

অষ্টাক্ষরী গায়ত্রী ছন্দে সৃষ্টিরই প্রকাশ। একাদশ অক্ষরের গায়ত্রী মন্ত্রই সূর্যের গতি পরিধি যার সময় ১১ বৎসর। বৈদিক যুগের সাধনায় ছিল উচ্চভাব—সে ভাব বুঝতে চাই আধ্যাত্মসাধন।

যাস্কের মতে যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাই মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রবিজ্ঞানের ধারা আজ আর তেমন ভাবে প্রচলিত নয়—নেই সেই ছন্দ। যে সামবেদের ছন্দে সরস্বতী নদী নেমে এসেছিল সুউচ্চ পর্বত থেকে সে সুর আজ অবলুপ্ত। সে সময়কার বৈদিক ছন্দ, আবৃত্তিক্রম সবই ছিল বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ব্যঞ্জনা। আরোহ অবরোহ একই সৃষ্টিক্রমের দুরকম ব্যাখ্যা। বৈদিক যুগে ছিল শততার বিশিষ্ট যন্ত্র. কি ব্যঞ্জনা ছিল তার। আজ সে সব অবলুপ্ত। তবু তার কিছু রেশ থেকে গেছে। সঙ্গীত বিদ্যা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে ভাবের পথে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আবার পুনরায় সৃষ্টি সবটাই যেন বিশ্বসঙ্গীত। ওঁ কারই প্রথম আদিধ্বনি মহাব্যোমের প্রথম প্রকাশ। মহাব্যোমের সেই ওঁকার ধ্বনিতেই হয় বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রলয়। জীবের মায়া সেও ব্রহ্মে যুক্ত। তারও মাত্রা আছে। মায়ার আবরণ মায়ার মাধ্যমেই খুলে যায়। পূর্ণ আত্মবিকাশই মায়ার লক্ষ। এজন্য চাই আধ্যাত্মজ্ঞান।

সঙ্গীতের মাধ্যমে হৃদয়ের বিকাশ ঘটে, আধ্যাত্মজ্ঞান জাগে। সুরের প্রাবল্যে জড়েও জাগে প্রাণ। শুরু থেকেই জড়ে প্রাণ থাকে তবে সুপ্ত অবস্থায়। সুরতরঙ্গ তারই বিকাশ ঘটায়। সুর কেন্দ্রের অবরোহ গতিতে মায়ার শুরু হয়—আরোহে তাই ওঁ তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়। মায়াই একং। আলাপে আছে মুক্তির ভাব-ভাবের গাঢ়ত্বে উধাও যার গতি—অন্তহীন যাত্রাপথের উদ্দেশে।

গানের মত সরস উপাসনা আর কিছু নেই। এ সাধনার শুরুতেও রস শেষেও রস। মীরা ভাবে—কিন্তু কজন বোঝে সেকথা ? সঙ্গীতই যে সাধনা তা মানে কজন ? এ উপলব্ধির জিনিস। হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। বৃন্দাবনলীলা একটি মহাসঙ্গীত যার সুর অনাদিকাল ধরে বিশ্বে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বৃন্দাবনের ষোল হাজার গোপিনী প্রত্যেকে এক একটি রাগমূর্তি। ষোল হাজার রাগ সৃষ্টি করে তারা নিবেদন করেন প্রেমাস্পদের কাছে। সে রাগানুভূতি আজ বিলুপ্ত। তবু সূক্ষ্ম চেতনায় হৃদয়

অতিক্রম করে বৃন্দাবনলীলা অনুভব করতে চেষ্টা করা—প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা। অনুভূতির স্তর বেয়ে ঝরে পড়ে—ভাবরস।

নারদের মতে স্বর ৭টি, গ্রাম ৩টি মূর্চ্ছনা ২১টি এবং তান ৪৯টি। এই নিয়ে স্বরমণ্ডল। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যমা, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই নিয়ে সপ্তস্বর। ষড়জ, মধ্যমা গান্ধার এই তিন গ্রাম। ষড়জ ভূলোকজাত—মধ্যমা এসেছে ভুবলোক থেকে, স্বর্গ থেকে গান্ধার। ষড়জ পদ্মপত্রপ্রভ, গান্ধার কনকাভ পঞ্চম কৃষ্ণবর্ণ, ধৈবত পীতবর্ণ, তিনটি গ্রামের তিনটি স্থান। ভূ ভুবঃ স্বঃ। সপ্তস্বর এবং গ্রাম মানুষের শরীরের মধ্যেই বিদ্যমান। ব্যোমচক্রে সব সুরই আছে। শরীরের অভ্যন্তরে সাতটি স্থানকে আশ্রয় করেই সপ্তস্বরের সৃষ্টি।

অনাহত শব্দস্য যো ধ্বনিঃ। ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ। তন্মনঃ বিলয় যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরম পদম।

বাধাশূন্য সে শব্দ (অনাহত ধ্বনি) সেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতি, সেই জ্যোতির অন্তর্গত যে মন—সেই মনের যেখানে লয় হয় তাই বিষ্ণুর পরম পদ। সঙ্গীত শব্দ-ব্রহ্মের অন্তর্গত। শ্রোতাও সাধক হতে পারেন যদি প্রকৃতই সেখানে ডুবে যেতে সক্ষম হন। পঞ্চবদন শিবের স্থান বিশুদ্ধচক্রে। এখানে আছে সপ্তস্বর। সুরকেন্দ্রের সুর স্বর সবই এই স্থানে বিদ্যমান। এই চক্রে 'আকাশ' বীজ। বায়ুর সৃষ্টিও এই চক্রে। অনাহতে নিস্তরঙ্গ ভাবে বায়ুর স্থিতি। বর্ণ ও ধ্বনির মূল এই আকাশে বায়ু আহত হয়েই সুরাদির সৃষ্টি।

বায়ুর কার্যের ব্যাখ্যা চলে না। সব কিছুর মূলেই বায়ু। বায়ুর স্থিতি সব খানেই সৃষ্টির শুরুতে আছে আনন্দ। এই আনন্দের উৎপত্তি সহস্রারে। আনন্দই অহংরূপে হুকুম দিচ্ছে। সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে পবন পরমাণুর সংযোগে মহাবায়ুর সৃষ্টি হয়ে আকাশে স্পন্দিত হতে থাকে। স্পন্দন আছে কিন্তু তরঙ্গ নেই তাই অনাহত ধ্বনি। স্পন্দনই অনাহতের ধ্বনি। জ্যোতিই তার পিযূষ যা সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মনের ব্যাপ্তিই হৃদয় আকাশ। অহংরূপ আনন্দই রাগরূপে ব্যক্ত—তারই প্রকাশকে বলে রাগিনী। ছয়রাগ ৩৬ রাগিনী। সুরকেন্দ্রকে স্পর্শ করলেই সাধনা সার্থক। সুরের অন্তর্নিহিত রহস্য যে সাধক উপলব্ধি করতে পারেন তিনি সঙ্গীত বিদ্যার পরিভাষা না জানলেও তার সবকিছু পাওয়া হয়ে যায়। বৈদিক মন্ত্রে মহাদেব ও বৃষের কথা আছে। উল্লেখ আছে বাক্যের চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি চরণ, দুই মস্তক-ও সপ্ত হস্ত। বৃষস্বরূপ ত্রিভাগে বদ্ধ মহানদেব রব করছেন এবং মানব শরীরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। বৃষের চার শৃঙ্গ অর্থাৎ নাম+আখ্যাত+উপসর্গ+নিপাত পদসমাষ্ট বা শব্দরূপ। চরণত্রয়—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

মস্তকদ্বয় নিত্য ও ব্যঞ্জ অর্থাৎ প্রকাশ্য এবং কার্য সপ্ত হস্ত অর্থাৎ ৭ প্রকার বিভক্তিই ৭টি হাত।

এই শব্দ অর্থাৎ মহানদেব (ব্রহ্ম) এর সঙ্গে সাম্যতা বোধ করা অর্থাৎ একাত্ম বোধ আনানোই সঙ্গীত বিদ্যার কার্য। ধ্বনিকে ভাবের ভঙ্গীদিয়ে অন্তর্নিহিত

ভাবকে প্রকাশ করাই সুরের দায়িত্ব। বিশ্বজুড়ে মহাগীতির ধারা বর্তমান। সঙ্গীতের সুরকেন্দ্র সহস্রার। অসংখ্য সুরেব মধ্যে দিয়ে সহস্রারে যখন সুর এসে মেলে বাসনার পরিতৃপ্তি হয়। ওঁকারই আদি স্বর। সব উচ্চারনের মূল সেখানেই নিহিত। বাঁশীর সুরেই সুর স্বর নির্ভুলভাবে নিরূপিত হত। ভরত বলেছেন গাতা যং যং স্বরং গচ্ছেৎ তং তং বংশেন তানয়েৎ। বাঁশির সুরে যমুনা উজান বয়েছিল। বৈদিক যুগে শততার বিশিষ্ট যন্ত্রে ১০০ টিরও বেশি—শুদ্ধস্বর পাওয়া যেত তা আজ লুপ্ত। ভাবই গানের প্রাণ। কুণ্ডলিনীর সজাগ ভাব শুরু হয় নাভিস্থান থেকে। তাই নাভি থেকেই সুর তোলা বিধেয়। সুর ও শব্দের যোগে যে ভাব ওঠে তা হৃদয়ের পরদায় পরদায় ঝঙ্কৃত হতে থাকে। ঐ ঝঙ্কৃত সুর সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলে।

নারীহৃদয় স্বতঃই বিকশিত। সঙ্গীত শাস্ত্রের রসবিকাশের কেন্দ্রস্থল নারীহৃদয়। শক্তিময়ী নারী অতিসহজেই সুরকেন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বিকাশ—সুর গরিমার প্রকাশ হয় নারীহৃদয়ে। বৃন্দাবনলীলা একটি মহাসঙ্গীত—যার সুর অনাদিকাল ধরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বিশ্বমূলে আছেন দুজন, পুরুষ ও প্রকৃতি। সেই অংশ থেকেই উঠছে বিশ্বসুর। নারীতে প্রস্ফুটিত সুর কেন্দ্রের বিভব, তাই সঙ্গীতে সহজেই মুগ্ধ হয় নারী। গায়ত্রী 'ছন্দসাংমাতা।'

মীরার ভাবসাধনা মূলতঃ সংগীতকে কেন্দ্র করেই। ভাবই আসল। রসের সাগরে ডুব দিতে পারাটাই বড় কথা তখন সবই বোঝা যায়। চেষ্টা করে বুঝতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু ভাবরসের পথিক খুব কম। যীবা উপলব্ধি করেছে বেশির ভাগ মানুষই জ্ঞানের পথে যেতে চায়। ফলে অচিরেই ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। কিছু জানতে চেওনা—জানতে চাইলেই তিনি আরো দূরে সরে যান। যশোদা যেমন বাঁধতে চেয়েছিলেন শিশু কৃষ্ণকে। পারেননি নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। পূর্ণ মাতৃত্বময়ী যশোদা গোপালকে বন্ধন করার সে কি প্রচেষ্টা।

একদিন আঙিনায় গোপালকে রেখে গৃহকাজে ব্যস্ত ছিলেন যশোদা। খেলতে খেলতে শিশু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখল শিকেয় অনেক ননীর ভাড় ঝোলানো রয়েছে। বুদ্ধি করে একটা লাঠি দিয়ে ভাড় ফুটো করে তলায় মুখ পেতে দাঁড়িয়ে রইল ননীচোরা। এভাবে একটির পর একটি ভাড় যখন শেষ হয়ে গেল তখন যশোদা এসে হাজির। ছেলের কাণ্ড দেখে রেগে আগুন। যশোদা দড়ি এনে গোপালকে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। গোপাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধনের অপেক্ষায়। কিন্তু যশোদার আর বাঁধা হচ্ছে না। দড়িটা বড় হওয়া সত্ত্বেও কুলোচ্ছে না। যতবারই বাঁধতে যান ছোট হয়। তিনি আরও দড়ি এনে বাঁধতে লাগলেন কিন্তু প্রতিবারেই এক অবস্থা। সমস্ত দড়ি যেন গ্রাস করে ফেলছেন শিশু কৃষ্ণ। অবশেষে যশোদা পড়লেন ক্লান্ত হয়ে। এই দাম গ্রাস করার জন্যই কৃষ্ণের আরেক নাম দামোদর। মায়ের কষ্ট দেখে অবশেষে দুঃখ হল তার—স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন—বন্ধন গ্রহন করলেন।—ঠিক এই ভাবেই ভক্তের কাছে আসেন তিনি। জানব বললেই তাঁকে জানা যায় না। সব প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁকে পেতে হলে চাই অনুরাগ—প্রেম। তবেই ধরা দেন তিনি না হলে নয়। যতদিন তুমি চেষ্টা চালাবে যশোদার মতই বাড়বে ক্লান্তি আর অবশেষে হতাশা। সময় হলে তিনি নিজেই আসেন সাড়া দেন ভক্তের ডাকে। এজন্য চাই অসীম ধৈর্য।

এত সুন্দর করে কথা বলে মীরা—শব্দের ঢেউ ভক্তের হৃদয়ে আলোড়ন তোলে ভাবরসে মাতোয়ারা বৃন্দাবনবাসী। এমন সহজ করে ভালবেসে তাকে পাওয়া যায় এই প্রথম জেনেছে তারা। মীরা জানিয়েছে। ওরা ভালবেসেছে।

শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে অবশেষে দেখা হল। চিতোরে থাকা কালীনই শ্রীজীব গোস্বামীর পাণ্ডিত্য ও ভক্তির কথা কানে এসেছিল। বৃন্দাবনে এসে আর দেরী না করেই চলে এসেছে মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু প্রথমে তিনি রাজী হননি। মীরা দেখা করতে এসেছে একথা শুনেও বলে পাঠিয়েছিলেন যে, কোন নারী মুখ তিনি দর্শন করেননা কাজেই মীরাকে ফিরে যেতে হবে। নাহলে তাঁর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে। মীরাবাঈ সেদিন হেসেছিল। অত বড় পণ্ডিতের কাছ থেকে সে এরকম উত্তর পাবে আশা করেনি—বলেছিল নিজেকে পুরুষ ভাবেন বলে এখনও তিনি এরকম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন। বৃন্দাবনে সেই গিরিধারী ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব কোথায়? পুরুষ সেই একজনই। শ্রীজীব গোস্বামী যদি নিজেকে এখনও পুরুষ ভাবেন তাহলে বৃন্দাবন ছেড়ে তার চলে যাওয়াই উচিত। মীরার এ কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী। এতবড় সত্য কথা তো এমন করে বলেনি কেউ। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে তার। সত্যিই তো বৃন্দাবনে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ কোথায়? এতদিন ধরে কি ভ্রান্ত ধারণাই না পোষণ করে এসেছেন। অহং ঘুচে গেল শ্রীজীব গোস্বামীর। ক্ষমা চাইলেন মীরার কাছে—কৃষ্ণ কথা নিয়ে এরপর অনেক আলোচনা হল। এতদিন তাঁর ধারণা ছিল তিনিই পরম জ্ঞানী। আজ দেবীস্বরূপিনী মীরার কাছ থেকে পরম শিক্ষা লাভ করে নবজীবন পেয়েছেন তিনি।

মাঝে মাঝে গুরু রুইদাসের কথা মনে পড়ে। সেই যে কবে পথ দেখিয়ে চলে গেলেন আর দেখা হল না। তাঁর কথা মনে হলে চোখে জল আসে। অমন মানুষ হয় না।

চিতোরের সিংহাসনে এখন উদয় সিংহ বিরাজ করছে। বিক্রমজিতকে হত্যা করে বনবীর চেয়েছিল রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হাতে নিতে। কিন্তু তা হয়নি। বনবীরকে কেউই পছন্দ করতনা। সে চেয়েছিল রাজ ক্ষমতাকে সুখের উৎস বানাতে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা হতে দেয়নি। তারা একজোটে সভা করে বনবীরকে ক্ষমতা থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফিরিয়ে এনেছে উদয়কে। তখন ১৫৩৮ সাল। প্রথমে উদয়কে স্বীকার করতে চায়নি বনবীর, সকলেই যুদ্ধের আশংকা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিতোরের সমস্ত শক্তি যখন একত্রিত হল তখন চিতোর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল বনবীর। এক

দিন গভীর রাতে আত্মীয় স্বজন ধনরত্ন নিয়ে সে পালিয়ে যায়। তার আর খোঁজ মেলেনি।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল মীরা। উদয় বিপদমুক্ত হয়েছে। এরপর মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে উদয়—কিন্তু মীরা যায়নি। তার মন আর এখন চিতোরে বসবেনা বুঝেছে সে। তবু বারে বারে প্রত্যাখ্যান করেছে মীরা। উদয় কষ্ট পেয়েছে। জানে সেকথা। তবু আর নতুন করে মায়ার বন্ধনে জড়ায়নি নিজেকে। এর অল্প কিছুদিন পরেই বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে এসেছে দ্বারকায়।

আজকাল আর কিছু ভাল লাগেনা। সারাক্ষণই অন্য কোন ভাবনায় সংযুক্ত থাকে। দ্বারকায় এসে মেলামেশা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এখন একা থাকতেই ভাল লাগে। কয়েকদিন আগে ধর্ম আলোচনা সভা থেকে ডাক এসেছিল। মীরা যায়নি। এখন আর আলোচনা ভাল লাগে না। সারাক্ষণই ডুবে থাকে মীরা ভাবরসের সাগরে। বৃথা আলোচনায় আব কিইবা প্রয়োজন ?

ভোজরাজেব কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে আরো অনেক স্মৃতি।

ছোট ছোট কথা, কত কাহিনী। স্মৃতিগুলো আনন্দ দেয়—পুরোনো দিনের কষ্টের কথা এখন আর তেমন করে বাজেনা। এখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

তাঁর কৃপায় এখন সমস্ত অন্তর ভরে থাকে। ব্যক্তিগত সকল সীমা মুছে গেছে তার। দিব্য আনন্দে সদাই ভরপুর। তিনি আসেন কথা বলেন। মীরা স্পষ্ট শুনতে পায় তুমি সব ত্যাগ করেছ—জ্ঞান এমনকি চেতনা পর্যন্তও। হৃদয়কে তুমি তৈরি করে নিয়েছ তোমারই মত করে। তোমার প্রেম সর্বত্র, নিরন্তর বৃহত্তব হয়ে তীব্রতর হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। এগিয়ে চল। শুধুমাত্র তোমার জন্যই নয়। জগতের কাম্য সেই নবজ্যোতি সর্বজীবে প্রমূর্ত হয়ে উঠুক তোমারই প্রচেষ্টায়।

মীরা ভাবে মানুষের বহিশ্চর জীবন কালের পবিনামস্রোতে ভেসে চলেছে। সে মনকে আমরা আমাদের স্বরূপ বলে জানি এই পরিণাম প্রবাহের অনাদি অতীতকেও সে যেমন জানেনা তেমনি জানেনা সুদূর ভবিষ্যতকেও। মাঝখানে শুধু বর্তমানের সংকীর্ণ পরিসর তাও স্মৃতির আবরণে ঢাকা অনেকটাই। এ জীবনেরও কত স্মৃতি তলিয়ে যায় অতলে। ক'জন ধরে রাখতে পারে ? তবু মানুষ বিশ্বাস করে বর্তমানকে। ক্ষনিক সত্যই আমাদের অস্তিত্বের পরিচয় কিন্তু এটুকুইতো জীবের কালকৃত পরিনামের যথার্থ পরিচয় নেয়। মানুষের আত্মস্বরূপ অজয় অমর। নটের একটি চরিত্রের অভিনয়েই যেমন লীলার সমাপ্তি ঘটেনা তেমনি একটি দেহের মরনেই মরন হয়না আত্মার। অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতে জীবসত্ত্বার ব্যাপ্তি থাকবেনা একথা অকল্পনীয়। নিজের প্রাণের তত্ত্ব জানতে হলে ডুব দিতে হয় অনন্ত প্রাণতত্ত্বে। এই দেহের পরিচয় খুঁজতে হলে অখণ্ড প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে হয়। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমষ্টি প্রকৃতির নিয়মে ব্যাষ্টি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। অখণ্ড সত্তার চৈতন্য সাগরে আমরা ভেসে চলেছি নিরন্তর—নিজেকে খণ্ডিত করে তবু সেই চৈতন্যের সঙ্গে কতটুকু যোগ আছে মানুষের ? জগৎ আমাদের মধ্যেই স্পন্দিত হচ্ছে অথচ

মানুষ ভাবছে তারা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। রাসলীলা নিত্যই চলছে—

কৃষ্ণ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গোপীরা সবাই পাগল। প্রেমের উজ্জ্বল পরকাষ্ঠা। লোক নিন্দার ভয় নেই। ঔপপত্য দোষ ঘটবে জেনেও তারা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী। তারা মধুর রসের নায়িকা। চতুর চূড়ামণি তবু ছলনা করে চলেছেন—

বলছেন—ঔপপত্যে সে দোষ তো শুধু তোমাদেরই নয়। পরনারী সংস্পর্শে এলে পুরুষেও বর্ত্তায়। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে আমিও দোষের ভাগী হব। প্রিয়জনের ক্ষতি করতে চাও এ তোমাদের কেমন ভালবাসা? তাই যদি হয় তাহলে তোমাদের এ ভালবাসার অর্থ আমি বুঝতে পারছিনা। সঙ্গলাভকেই যদি ভালবাসার সার্থকতা মনে করে থাক তবে ভুল করেছ। অঙ্গে অঙ্গে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়না পায় ভালবাসার মাধুর্যে। এতই যখন ভালবাস আমাকে—তখন নিরন্তর আমাকে ধ্যান কর আমার কথা নিয়ে থাক। গৃহে ফিরে যাও—আমার সঙ্গ লালসা কোরো না।

শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ব্রজাঙ্গনারা অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কথা নেই। অন্তর ফেটে যায়। চোখের কাজল ধুয়ে যাচ্ছে অশ্রুধারায়। বসন সিক্ত। কণ্ঠ রুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর ডাকে তারা পাগলিনীর মত ছুটে এসেছে। সবধর্ম পরিত্যাগ করে তারা ভালবেসেছে শ্যামলিয়াকে। নতমুখে তারা মাটিতে আঁচড় কাটছে আর মনে মনে বলছে হে ধরিত্রী এসে আমাদের দুর্দশা দেখে যাও। শোনো কি উপেক্ষার বাক্য। দেখি কেমন করে তুমি সর্ব্বংসহা নাম বজায় রাখতে পারো। আমাদের এই দুর্দশায়—তোমাকেও সর্ব্বংসহা নাম পরিত্যাগ করতে হবে। এ লাঞ্ছনা অসহনীয়। হেভূমি সীতা জননী। দৈবকী তোমার কোলে আশ্রয় পেয়েছিল আজ দয়া করে আমাদেরও আশ্রয় দাও। আর বাঁচি না।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে। গোপিনীরাও ভাবতরঙ্গে দোল খায়। তবু তারই মধ্যে একজন গোপী মুখ খুলেছে।

শ্রী গোপ্য উচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য
সর্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ। মা ত্যজাস্মান দেবো
যথাদি পুরুষো ভজতে মুমুক্ষূণ্॥

তাদের অন্তরের ভাব হল—

হে প্রভু। আপনি এইরকম নিষ্ঠুর বাক্য বলতে পারেননা। আমরা সবকিছু পরিত্যাগ করে তোমার চরণের সেবা নিয়েছি। সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আদি পুরুষ দেব যেমনভাবে গ্রহণ করে থাকেন সেইভাবেই আমাদেরও গ্রহণ কর। আমাদের ত্যাগ কোরোনা। তুমি তো অনেক ধর্মোপদেশ দিয়েছ সব শুনেছি। তুমি বলেছ নারীর ধর্ম পতিসেবা, সন্তান পালন। তোমার এই উপদেশ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তুমি যে এত ভাল ভাল কথা জান তা আজই প্রথম জানলাম। কিন্তু একটা কথা

জেনে রাখো তোমার এই উপদেশের যোগ্য পাত্রী কিন্তু আমরা নই। যদি প্রশ্ন কর যে নিয়মের নৌকায় চড়ে শত শত যাত্রী পার হচ্ছে দিবারাত্র আমরা কিভাবে তার ব্যাতিক্রম হলাম তাহলে বলি শোন—সংসার পথের যাত্রীর জন্যই উপদেশের প্রয়োজন। গন্তব্যস্থলে যেতে হলে পথে অনেক বিপদ আছে তাই সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ধর্মশাস্ত্রের এই সুমধুর উপদেশগুলি। তাই যারা জীবন পথের পথিক তাদেরই এই সকল ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে আর পথিক নয়। যে পথ ছাড়িয়ে গন্তব্যস্থলে পেঁাছে গেছে—যে আর যাত্রী নয় তার আর উপদেশে কি কাজ? আমাদের যাত্রা শেষ সব কিছু পার হয়ে আমরা এখন তোমার কাছে এসে পেঁাছেছি। আমাদের লক্ষ তুমিই। এখন যদি প্রশ্ন কর —যে তুমিই সে আমাদের গন্তব্যস্থল তা কি করে বুঝলাম তাহলে বলি—জীবের গন্তব্যস্থল কোথায়? সেখানে গেলে জীবের আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকেনা। যিনি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, যিনি অন্তরে থেকে সকল বেদনা অনুভব করেন, অন্তর্যামী তিনিই পরমস্থান। সেই স্থান যে তোমারই পাদপদ্ম একথা জানতে ধর্মালোচনার দরকার হয়না। তুমি যে পরমপ্রিয় বন্ধু একথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি। অনুভূতির চেয়ে বড় শাস্ত্র আর কিছু নেই।

কি গভীর বিশ্বাস কি ভালবাসা। একেই বলে প্রেম। ভালবাসা দিয়ে সেই পূর্ণব্রহ্মকে কত কাছের করে নিয়েছিল গোয়ালিনীরা। যাদের প্রেমের কাছে স্বয়ং লক্ষ্মীকেও হার মানতে হয়েছিল।

ভাগবতে আছে—

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করছেন কৃষ্ণরূপী নারায়ণ যখন বৃন্দাবনে গোপ কুলে গোপাল হয়ে অপ্রকট লীলা করলেন তখন শুধু ব্রজগোপীরাই রাসস্থলে স্থান পায়। কিন্তু কোন সাধনার ফলে দেবকন্যা, মুণিকন্যা ও নাগকন্যারা স্থান পেল তা বলুন। তখন ঋষি বললেন সেদিন রাসলীলায় যারা যোগ দিতে পেরেছিল তারা ছিল নিত্যসিদ্ধা, কৃপাসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। যে শতকোটি রমণীরা রাসলীলায় অংশ নেয় তার মধ্যে ষোল সহস্র ছিল প্রধান এবং তাদের মধ্যে আবার সর্বলক্ষ্মীময়ী দেবী শ্রীমতী ছিলেন সর্বপ্রধানা। এই ষোল সহস্র রমণী ছিল নিত্যসিদ্ধা। কারণ গোলোকে একদিন নারায়ণ নিজ অঙ্গ থেকে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারাই লীলা করার জন্য ব্রজভূমিতে জন্ম নেন।

যেসব দেবকন্যা, মুনিকন্যা ও নাগকন্যা পূর্বজন্মে বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হবার বাসনা পোষণ করে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তটে তপস্যা করে তারা ছিল কৃপাসিদ্ধা। তাদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু কৃপা করে তাদের বর দেন দ্বাপরের সন্ধিকালে আমি যখন লীলা করব তখন তোমরা আমার সঙ্গ দেবে।

রাম অবতারযুগে দণ্ডকারণ্যে যেসব মুণিকন্যারা রামের সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছা করে তাদের রাম একই কথা বলেছিলেন। তারা ছিল সাধনসিদ্ধা।

এছাড়া অপ্রধানা রমণীরা নিত্যসিদ্ধা ষোড়শ সহস্র সখীদের অনুগত হয়ে তাদের

সেবা করতে থাকে। এইভাবে নিত্যসিদ্ধা, কৃপাসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা রমণীরা সকলেই কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে পতিভাবে তার ভজনা করতেন। এদের মধ্যে প্রধানা গোপী ছিলেন রাধারাণী।

শুকদেব বলছেন—

নারায়ণরূপী কৃষ্ণ একাধারে নিগু্ণ, সৎ ও আনন্দময়। তিনি সত্ত্ব, রজ, তম গুণের বশবর্তী হয়ে সৃজন পালন ও ধ্বংস করেন।

এর থেকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুর উৎপত্তি হয়। এগুলি সর্বজীবের আধার কৃষ্ণরূপী নারায়ণেও আছে। তাই কাম, ক্রোধ, ভয়, ভক্তি, স্নেহ, বন্ধুত্ব প্রেম যে যেভাবে তাকে আরাধনা করে সেভাবেই তাকে পায়।

কিন্তু যে মধুরভাবে ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে লাভ করেন সেই প্রেমভাবই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মীর এক অংশ রাধারূপে মর্তে এসে জন্ম নেয় এবং অন্য এক অংশ বৈকুণ্ঠে থেকে যায়। কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর মনেও রাসলীলা করার বাসনা জাগে। লক্ষ্মীদেবী গোপনে তপস্যা শুরু করেছেন জানতে পেরে কৃষ্ণ তাকে কাছে আসার জন্য মনে মনে আদেশ দেন। কৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীর মনের বাসনা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন। 'বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এলে কেন তুমি?' লক্ষ্মী বললেন 'তোমার বাঁশি শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। বৃন্দাবনের রাসলীলা দেখার বড় বাসনা হল।' কৃষ্ণ বললেন "এই লীলা দেখার অধিকার একমাত্র গোপী-দেরই—তোমার সে অধিকার নেই। একান্তই যদি দেখতে চাও তবে গোপীভাবে ভাবিত হয়ে গোপীদের পিছু পিছু যেতে হবে তোমাকে। লক্ষ্মীদেবী তখন সজল নয়নে বললেন 'একি কথা শোনালে প্রভু? আমি তোমার প্রধানা মহিষী হয়ে গোপী-দের পিছু পিছু যাব—এ কি করে সম্ভব?' অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই রাজী হলেন না। এবং লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন। ব্যাসদেব এই কথাই বলেছেন কিন্তু অন্য মতে আছে লক্ষ্মীদেবী অনেক কাকুতি মিনতি করে রাস দেখার অধিকার লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ অনেকবার বারণ করা সত্ত্বেও লক্ষ্মীদেবী মানলেননা। অভিমানভবে তিনি সব গহনা খুলে ফেলতে লাগলেন। চুল খুলে অবশেষে মাটিতে এলিয়ে পড়লেন। তাই দেখে কৃষ্ণের বড় কষ্ট হল। লক্ষ্মীকে কোলে তুলে নিয়ে তার ধূলিধূসরিত অঙ্গটি নিজের পীতাম্বর দিয়ে মুছিয়ে দিলেন অবশেষে কমলার রাস দেখার অনুমতি মিলল তবে অব্যক্তভাবে দেখতে হবে এই স্থির হল। এরপর অব্যক্তভাবেই লক্ষ্মী রাসলীলা দর্শন করেন।

এতো গেল ভাগবতের কথা। মীরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করছে রাসলীলা। বাঁশির সুর আজকাল আর ঘরে থাকতে দেয়না। কেবলই ডাকে। সময় হয়ে এসেছে আর দেরী নেই। বৈকুণ্ঠের নিত্যধামে আছে আনন্দ জ্যোতির পূর্ণোচ্ছাস তারও পরে আছে লোকোত্তর আনন্দের দিব্যভূমি। মানুষের শরীরে আত্মা নেমে এসেছেন জন্মের পথ ধরে সৃষ্টির আঙিনা বেয়ে—যুগ থেকে যুগান্তরে আবর্তিত

হয়ে চলেছে মানব জাতির প্রগতির তপস্যা। শুধু বিশ্বোত্তীর্ণ মহিমাতেই নয়—নানাভাবে তিনি চান তাঁর নিত্যসিদ্ধ আনন্দস্বভাবের অনুভব। স্থূলদেহের কারাগারে নিজেকেই বন্দী করেন তিনি। আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আনন্দ বেদনায় ভাসতে ভাসতে ফুটিয়ে তুলতে চান সত্যও আনন্দের পারিজাতপুষ্প। কখনও নিজেকে আবৃত করে কঠোর সাধনায় সে আবরণ ঘুচিয়ে পেতে চান আত্ম আবিষ্কারের আনন্দ। তাই সাধনপথের কচিৎ স্খলন সৃষ্টির অভিশাপ নয়—দেবশক্তির সহায়তা লাভ। প্রকৃতির অনাদি জ্যোতিশক্তির এক ক্ষুদ্র অংশরূপে অবিদ্যারূপে আসে প্রমাদ—কখনও বা। কিন্তু পূর্ণব্রাহ্মী স্থিতিতে অবিদ্যার স্থান নেই। প্রমাদ একটা সাধারণ বৃত্তি মাত্র তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু সকলে সেকথা বোঝেনা। মীরাও আগে বোঝেনি এমন করে। এখন গিরিধারীই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সত্যকে আপেক্ষিক অর্থে ধরলে সে সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকে পক্ষপাত। আলো না থাকলে ছায়াও নেই। তবে আলোর প্রকাশের জন্য ছায়ারও নেই কোন অবশ্যম্ভাবীতা।

আসল কথাই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান আসে সাধনাকে অবলম্বন করে। সে জন্য চাই সদগুরু। সদগুরু সকলের ভাগ্যে জোটেনা। টানের প্রাবল্য থাকলে অনেকসময় মেলে। মীরা অনেক ভাগ্য করে রুইদাসকে পেয়েছিল। সবই সেই গিরিধারীর দয়া। রুইদাস ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। অলসনিরঞ্জনের উপাসক। সম্প্রদায়গত ব্যবধান কোনদিনই তার সাধনাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। তবু সম্প্রদায়গত বিভেদের কথা অজানা নয় তার। মারওয়াড়ের রাঠোর কুল নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। তাদের মধ্যে প্রথা ছিল বিবাহ ও যজ্ঞোপবীত সংস্কারকালে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হত। কুল প্রথানুসারে বিবাহের সময় নিম্বার্ক মতে দীক্ষা হলেও বিবাহের পর রুইদাসের কাছে দীক্ষা নেয় সে।

রামানন্দী সম্প্রদায়ে গিরিধর গোপালকে ইষ্টভাবে উপাসনা করার কোন রীতি ছিলনা একথা সত্য। তবুও রুইদাসকে গুরুরূপে মেনে নিতে কোন দ্বিধা হয়নি তার। সেই শুরু থেকেই সংস্কারমুক্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সেই অলস নিরঞ্জন আর তার প্রিয় গিরিধারীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। ঈশ্বর এক। সারাজীবন ধরে একথাই বোঝাতে চেয়েছে সকলকে কিন্তু পেরেছে কি? সংশয় জাগে। সংস্কার ত্যাগ করতে পারে ক'জন? ক'জন পারে সত্যিকার ভালবাসতে? মীরা উপলব্ধি করেছে মানুষ এখন আর মানুষকে তেমন করে ভালবাসতে পারেনা। সংকীর্ণতা এসে গেছে মানুষের মনে। স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে সকলেই সকলের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রেমই তো বৃহতের সন্ধান দেয়। মানুষকে না ভালবাসলে ঈশ্বরকে সে ভালবাসবে কেমন করে? নিজেকে দিতে পারাটাই সবচেয়ে সার্থকতা—পাওয়াটা বড় নয়। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারায় মধ্যেই আছে প্রকৃত শান্তি যা পৌঁছে দেয় চরম সত্যে। এসব কথা আজকাল আর কেউ শুনতে চায়না। অনেকেই ব্যঙ্গ করে। তবু বিশ্বাস রাখে সে, মানুষের একদিন আসবে যেদিন সর্ববিশ্বাসটুকু সে অর্পণ করবে তাঁর চরণে। নাহলে যে ব্যর্থ হচ্ছে

যাবে সবকিছু। তিনি যে মিথ্যা হয়ে যাবেন। সে তো হতে পারেনা কিছুতেই।

সাধনার পথ বড় কঠিন। জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে মীরা। তাই তো পরিণত বয়সে লিখেছে—

জ্যো মৈ এসা জানতী
প্রেম কিয়ে দুঃখ হোয়।
নগর ঢিররা পীটতি
প্রেমনাকী জৈ কোয় ॥

আমি যদি আগে জানতাম যে ভালবাসার এত যন্ত্রণা তাহলে সকলকে জানাতাম কেউ যেন এ পথে না আসে।

সাধনার শুরুতে "আমি তোমার" ভাবটিতেই নিহিত থাকে—সমস্ত সত্তা অনুভূতি। হে প্রাণনাথ তুমি দয়া করে আমাকে আপন করে নাও। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে ভাব বদলায়। তখন "তুমি আমার"—হে প্রভু, তুমি আমারই, যতই যন্ত্রণা দাও তবু তুমি আমার। প্রথম ভাবটি তদীয়া রতি দ্বিতীয় ভাবটি মদীয়া রতি। মদীয়া রতিই ব্রজের ভাব।

ধর্মের ব্যাখ্যা যুগে যুগে বদলায়। তার কথাও এর পরবর্তীকালে হয়ত বলা হবে অন্য গলায় অচেনা সুরে। তবু সত্য একটা থেকেই যায়। তার ধারণা মানুষের চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। ধর্মের চেয়ে মানুষ অনেক বড়। মানুষের হাতেই বহু সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মও তারই মধ্যে একটি। ধর্মের আচার, বুলি, অনুষ্ঠান, অন্ধসংস্কার এসবের কোনটাতেই তার আগ্রহ নেই। রাষ্ট্রের ভিত্তি ধর্মের মাটিতে গড়ে ওঠার অর্থই হল আকাশে প্রাসাদ গড়া। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সবাই ঐ শূন্য আকাশের দিকে চেয়েই তাদের ঈশ্বরকে খোঁজে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে—যারা সাহস পায় বল সঞ্চয় করে তাদেরও আশ্রয়স্থল এই মাটি। মাটিই মানুষকে শেষ আশ্রয় দেয় ঘর বাঁধতে শেখায় ধর্মতত্ত্ব অনুভব করায়। আকাশ চির দিনই শূন্য থাকে। সম্প্রদায়গত পরিচয়টাই ধর্মের প্রধান বাধা। পরিচয়টাই বন্ধন। একবার সে পরিচয়ের আবরণটুকু খসে পড়লে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন আর কোনো বাধা থাকেনা। এ দেশের প্রধান স্থাপত্য আর ভাস্কর্য শিল্পে কোনো শিল্পীর নাম নেই। কীর্ত্তি রেখে নাম মুছে দেওয়াই এ দেশের সংস্কৃতি।

আসলে বিশ্বসৃষ্টির লীলা যতদিন মানসিক ও নৈতিক বিচারের মাপকাঠিতে ওজন করা যায় ততদিন এর প্রকৃত মূল্য জানা যায়না। সৃষ্টিকে তুলতে হবে অনেক উর্ধ্বে তবেই এই সৃষ্টিলীলার অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেজন্য চাই সত্যের মধ্যে প্রবেশ করার আকুলতা। সময় লাগবে, ধৈর্য চাই। হয়ত পথের শেষে নাও পৌঁছুতে পার—ক্ষতি কি? জীবনের কোন কিছুই ফেলা যায় না। যদি সত্যিই কোনদিন একমুহূর্তের জন্য এসেও তাঁকে চেয়ে থাক তবে তিনিই পথ দেখাবেন। পাহাড়ের গা বেয়ে টিপটিপ করে ঝরে পড়া জল আজ হয়ত তেমন কোন পরিবর্তন আনবে না

এ কথা সত্য কিন্তু তার অবিরাম গতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কোনো না কোনো দিন পাথরের গায়ে দাগ ধরবেই। তপস্যা সেতো ফোটা ফোটা ভালবাসা ঝরে পড়া জল বিন্দু। তুমি যাকে জানতে চাও সে তো তোমারই অন্তরে বিরাজ করেছে তোমারই চেতনার অংশ হয়ে। সে তোমার মধ্যে আছে বলেইতো তাকে খুঁজে বেড়াতে চাও। সে যদি তোমার মধ্যে না থাকত তবে কোনদিনই তাকে পেতে না। আকুলতা চাই, চাই সর্বত্যাগী ভালবাসা তবেই তিনি সাড়া দেন। রূপ ধারণ করে নেমে আসেন মর্তলীলায়।

মীরার চিত্ত আজ বড়ই চঞ্চল। বেশ কিছুদিন ধরেই অন্য একটা অনুভূতি তাকে স্পর্শ করছে। শৈশবের কৃষ্ণপ্রেম যৌবনে তাকে যোগিনী করেছে। আজ জীবনের ক্লান্ত অপরাহ্নে প্রৌঢ়ত্বের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভালবাসার সুধাসিন্ধুতে ডুব দিয়েছে মীরা। সব পথের শেষ। যাত্রা সমাপ্ত। সে কেবলই বলছে আমি এসেছি। তোমায় নিয়ে যাব বলে। তবু এখন স্পষ্টভাবে সে ডাক শুনতে পায়নি এতদিন। গতবাতে শুনেছে যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজছে। আর তো সময় নেই। বেলা যে চলে যায়।

মীরা গায়—

তুমহরে কারণ সব সুখ ছাড়িয়া
অবমো.হ কু তরসায়ো।
বিরহ বিথা লাগী উর অন্তর
সো তুম আয় বুঝায়ো।।
আব ছোড়িয়া নহি বনে প্রভুজী,
হংস কর তুরত বুলয়ো।
মীরা দাসী জনম জনমকী
অংগসু অংগ লাগায়ো।।

তোমার কারণেই সব সুখ ছাড়লাম তবে কেন বঞ্চিত করে যাও। বিরহ ব্যথায় অন্তর ভরে আছে তুমি এসে তা থেকে মুক্তি দাও। এমন সময় ছেড়ে থাকা সাজেনা প্রভুজী হেসে হেসে ত্বরিতে বলে যাও।

মীরা জনম জনমের দাসী—
তোমার অঙ্গে অঙ্গলাগাও।

গান গাইতে গাহিতে দুচোখে নামে অশ্রুধারা। সে যে ধরা দিয়েও ধরা দেয়না। মনোহরণকারী রূপ দেখিয়েও আড়ালে সরে থাকে। মীরা স্পষ্ট দেখে গলে গুঞ্জমালা, মাথায় শিখিপাখা হাতে বাঁশরী আর চরণে মঞ্জীর পরিহিত সেই নব জলধর শ্যামকে। রাসলীলার নৃত্য গীতে যখন স্বর্গমর্ত্ত রসাতল কামময় হয়ে উঠেছিল তখন স্বর্গের দেবতারা মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। আর দেবীরা হলেন অচেতন। চারটি ভূষণ সমন্বিত কোটি কামজয়ী পুরুষ রতন কৃষ্ণকে দেখে পাগল হলেন সকলে। এ রূপ আগে কেউ কখনো দেখেননি। ঐ চারটি ভূষণ সম্পর্কে ভাগবত বলছেন—

নারায়ণের অংশ থেকেই লক্ষ্মীর জন্ম হয়। লক্ষ্মীদেবী আবার নিজ অংশ হতে ষোড়শ সহস্র গোপীকে সৃজন করলেন। এরা সকলেই ছিল নিত্যসিদ্ধা। এদের মধ্যে রাধা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা। রাধার এই সমর্থারিতির ঈশ্বর প্রেম দেখে চন্দ্র সূর্যের মনেই জাগল প্রেম সাধনার বাসনা। তাঁরাও কৃষ্ণ অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে থাকবেন কামনা করলেন। এই উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা আর উর্দ্ধে পা রেখে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন তারা। তাদের তপস্যা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন দেবগন। নারায়ণকে জানালেন ইন্দের ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য তারা তপস্যা করছেন। তখন নারায়ণ গেলেন তাঁদের কাছে বললেন তোমাদের তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি এবার বর চেয়ে নাও।

নারায়ণকে দেখে প্রণাম করলেন চন্দ্রসূর্য। বললেন শ্রীমতী রাধা যেমন সততই যুক্ত থাকে তোমার সঙ্গে আমরাও যেন তা হতে পারি। তোমার যে প্রেমে ধন্য হয়েছে শ্রীরাধা আমরাও যেন তোমার সেই প্রেম লাভ করি।

সব কথা শুনে নারায়ণ প্রথমে সূর্যকে বললেন 'শোনো সূর্যদেব এজন্মে তোমরা কেউই আমাকে পাবেনা। দ্বাপর যুগে যখন আমি বৃন্দাবনে লীলা করব তখন তুমি অপ্রকট গুঞ্জলতা হয়ে কুঞ্জ বেষ্টিত করে রাখবে। সেই গুঞ্জলতা দিয়ে মালা গেঁথে আমি গলায় তা পরব। ত্রিভুবনের সব নারী মুগ্ধ হবে তোমায় দেখে। কারণ পথ পদ্মরাগমনির মত উজ্বল গাত্রবর্ণ নিয়ে এক অংশে তুমি উদয় হবে আকাশে আর এক অংশে হবে স্ত্রীজাতীর গুঞ্জমালা। সেই থেকে গলদেশে গুঞ্জমালা ধারণ করেন কৃষ্ণ। এরপর চন্দ্রকে বললেন আমি যখন বৃন্দাবনে বিহার করব তখন তুমি সেখানে কাম্য বনে মথুরা অঞ্চলে শিখিকুলে জন্ম গ্রহণ করবে। তুমি হবে পুরুষজাতীয়। তোমার পাখা আমি ধারণ করব মস্তকে। তোমার রূপ যে দেখবে সেই পাগল হবে। এক অংশে তুমি বিরাজ করবে আকাশে আর এক অংশে বৃন্দাবনেশিখিপুচ্ছ হবে।

নূপুরেরও কাহিনী আছে। একবার স্বয়ম্ভু মনুপুত্র চন্দ্রকান্ত ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে এক কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তাঁর সেই তপস্যায় কেঁপে ওঠে দ্যুলোক ও ভূলোক। বসুন্ধরা তখন ব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে চন্দ্রকান্তের ধ্যান ভাঙাতে বলেন। তখন বিষ্ণু গিয়ে তার ধ্যান ভাঙালেন। চন্দ্রকান্ত নারায়ণকে বললেন প্রভু সততই যেন তোমার চরণে আমার ঠাঁই থাকে। নারায়ণ তখন বললেন বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে পদ্মশোভিত হ্রদে যখন আমি জলকেলি করব তখন তুমি আমার পায়ে ঠেকবে। আমি তোমায় পদযুগলে ধারণ করব। তোমার ধ্বনিতে মুগ্ধ হবে ত্রিভুবন। সেই থেকে নূপুর তার চরণে সততই বিরাজমান। এরপর বাঁশরীতত্ত্ব। বেণু মুরলী আর বাঁশরী এই তিনটির মধ্যেও পার্থক্য আছে। বেণু হয় আট আঙ্গুল প্রমাণ। মুরলী দ্বাদশ আর বাঁশীর মাপ হল অষ্টাদশ আঙ্গুল। গোষ্ঠে গরু চরানোর সময় বেণু বাজাতেন শ্রীকৃষ্ণ। বাড়িতে যশোদাকে শোনাতেন মুরলী। আর ব্রজগোপিনীদের কাছে বাঁশরী বাজাতেন।

রাধার সৌভাগ্য দেখে একবার সরস্বতীরও ঈর্ষা জেগেছিল। তিনি বিষ্ণুকে বলে-ছিলেন আমি তোমার অধরামৃত যেন সদাই পান করতে পারি। বিষ্ণু বলেছিলেন

কৃষ্ণাবতারকালে তোমাকে আমি বাঁশিরূপে গ্রহণ করব। তুমি সে অমৃত পান করার পর যা বাকি থাকবে তাই পান করবে রাধা এবং অন্যান্য গোপিনীরা।

কি ভাগ্য ছিল তাদের। স্বয়ং শ্যামসুন্দরের সঙ্গলাভ। এ সব দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলেই ভাব সমাহিত হয়ে পড়ে মীরা। নিজেকে নিথর রাখতে পারেনা। প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করে। কখনও বলে ওগো প্রিয় এ হৃদয় মন্দিরে তোমারই আরতি হোক। সকাল সন্ধ্যা তোমারই নামের আরতি যেন আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকে। এ শরীরকে প্রদীপ এবং মনকে বাতি করে নিবেদন করেছি তোমার চরণে। প্রেমের তৈল দিয়ে যে দীপ জ্বেলেছি তা রাতদিন জ্বলছে। জ্ঞানের মাদুর বিছিয়ে সকলের সুমতি ভিক্ষা করব। এ শয্যা বহুরকম ফুলে বিছিয়ে রেখেছি। রাতের তারা গুনতে গুনতে প্রভাত এলো তবু প্রভু তো এলেন না। শ্রাবণ ভাদ্র এসেছে বর্ষা ঋতু এসেছে। মেঘের ঘনঘটা ঘিরে নয়নজল নামছে। আমার মাতা পিতা আমাকে তোমাকেই দিয়েছেন কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ। হে প্রভু তুমিই আমার স্বামী। তুমিই পার আমাকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দিতে। ব্যাকুল মীরাকে এবার আপনার করে নাও। আর সরিয়ে রেখোনা।

উদয়সিংহ অনেকবারই দূত পাঠিয়েছে। মীরা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবার নিজে আসবে সে। পুরোহিত এসেছেন মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—তিনিই খবর এনেছেন এবার না গেলে মীরাকে নিতে উদয় নিজেই আসবে। মীরা মৃদু হেসেছে নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়েছে। আর নয় এবার সময় হয়েছে তার। ফিরে যেতেই হবে। তবে চিতোরে নয়। সেই পূর্ণব্রহ্মের কোলে। সেকথা কাউকে জানায়নি। এত দিনের অনেক সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব দোটানা থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন তিনি গতরাতে। ডাক দিয়েছেন। এখন শুধুই আনন্দ।

আনন্দই সৃষ্টি। তারই উৎস সন্ধানে সেই যে যাত্রা শুরু হয়েছিল সে আজ কতকালের কথা—

কো হ্যোবান্যাৎ কাঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ
আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি
জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি
জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং বিশন্তি
—তৈত্তিরীয়োপনিষদ

কেই বা বেঁচে থাকত কেইবা নিঃশ্বাস নিত যদি এই আনন্দ আকাশ হয়ে না ছেয়ে থাকত। আনন্দ থেকেই সবকিছু জন্মেছে—জন্মে আনন্দেই বেঁচে আছে আবার আনন্দেই তারা মিলিয়ে যাবে।

ব্রহ্ম চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই তার তাৎপর্য আনন্দই তার চেতনার স্বরূপ। চিন্ময় সত্তার পরাকাষ্ঠাই হল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রভাব। সব কিছুতেই আছে সেই আনন্দ চেতনা। ব্যবহারিক জীবনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সেই আনন্দকে মুক্তি দিতে

পারলেই তৃপ্তি। মানুষের অনাদিকায় আছে অনন্ত আত্মসংবিৎ। নিজেকে পাওয়ার অর্থই হল আত্মানন্দে মগ্ন হওয়া। ব্যবহারিক জীবনে সংকীর্ণ পরিসরে এই আত্মানন্দের স্পর্শ এসে লাগলেই জীবন সুন্দর হয়। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মার আনন্দ কখনও খণ্ডিত হয়না। তাঁর আনন্দ স্পন্দনকে রূপ বৈচিত্রের মাধ্যমে উপভোগ করাতেই বিশ্বলীলার মূল উদ্দেশ্য নিহিত। তবেই তো তিনি সচ্চিদানন্দ। এ বিশ্বের সব কিছুই সেই সচ্চিদানন্দের আনন্দে আনন্দিত। মীরা জানে এতদিন সে বিশ্বের বৈচিত্রকে উপলব্ধি করেছে দ্বৈতবোধের খণ্ড পরিনামরূপে আজ তাকে পেতে চলেছে পূর্ণসত্তায় সর্বগত আনন্দরূপে। পূর্ণব্রহ্মচেতনার রাসচক্রে।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্

কেনোপনিষদ

যে বস্তুর নাম হল আনন্দ। তাকে জেনেই আমরা তার উপসনা করব।

মানুষের জীবনমন্ত্র আনন্দের সুতোয় বাঁধা। এই আনন্দ আত্মানন্দ। এর জ্যোতি আত্মস্বরূপের জ্যোতি। কিন্তু মানুষের বহিশ্চেতনায় যে ক্ষণিকানন্দ জাগে তার কাছে এই সচ্চিদানন্দ অন্তর্গূঢ় হয়েই থাকে। এই আত্মানন্দই তো সর্বব্যাপী হয়ে বিশ্বের অনু পরমানুতে আত্মভাবের প্রতি অভিনিবেশ গড়ে তোলে—সকল চেতনা ঘিরে তারই প্রকাশ ঘটায়। প্রাণের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রেরণা জাগায়। আবার সেই বয়ে আনে নন্দনকাননের সুবাসিত বাতাস। অমৃতময় করে তোলে সৃষ্টিকে। মীরা আজ বোঝে বিক্রমজিতের অত্যাচারে একদিন সে যখন আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সেদিনও তার মনে ছিল অমৃত পিপাসা। জলে ঝাঁপ দিতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই নিজেকে উপলব্ধি করেছিল। স্বয়ং শ্যামসুন্দর এসে বাধা দিয়েছিলেন। আত্মহত্যার সাময়িক প্রবৃত্তিগুলোও অমৃত পিপাসারই বক্র ভঙ্গীমা। মানুষ কোনোদিনই নিজ সত্তার বিলোপ চায় না। বর্তমান সত্তার প্রতি অনীহাই তাকে রূপান্তরের প্রতি আকৃষ্ট করে। তাই আনন্দই আত্মভাব সৃষ্টির আদি রহস্য। আনন্দই সৃষ্টি এবং লয়—আনন্দেই মানুষ জন্ম নেয় আবার আনন্দেই তাদের শেষ পরিণতি।

এই মধুর ভাবটুকুই প্রাকৃত চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। দৈনন্দিনতার আড়ালে সবার অলক্ষে গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। দেহ মন প্রাণের সুখ দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরাত্মারূপে অখণ্ড চৈতন্যকে অনুভব করায়। সেই চির আনন্দময় পুরুষই সকলের আরাধ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেইতো মীরার শ্যামসুন্দর।

এখনো দিনের ব্যস্ততা জাগেনি। সমুদ্রতীর নিস্তব্ধ। শান্ত পরিবেশ। সাগরতীরে রনছোড়জীর মন্দির। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে মেখে সাগরজলে অবগাহন করল মীরা। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। বড় ভাল লাগছে। আজ বহুদিন পর নতুন করে নিজে হাতে নিজেকে সাজাল সে। গলায় পুষ্পহার, চরণে নূপুর। কপালে তিলক। প্রিয় মিলনের আকাঙ্খিত মুহূর্তে মীরা আজ আনন্দে বিভোরা। ভাবে মাতোয়ারা। রাজপুরোহিতকে আজ জবাব দিতে হবে। দুদিন সময় চেয়ে-

ছিল সে—বলেছিল 'উত্তর পেয়ে যাবেন তবে দুদিন পর। এ-দুদিন সারা দিনরাত ধরে ভেবেও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি তখন গিরিধারীই জবাব দিয়েছেন। বড় আনন্দের দিন আজ। এতদিনকার অপেক্ষা বুঝি সার্থক হতে চলেছে। আজ প্রিয় মিলনের পূর্ব মুহূর্তে অন্তর ভরে উঠেছে নির্মল আনন্দে।

মন্দির প্রাঙ্গনে মহারাণা উদয়সিংহ প্রেরিত রাজপুরোহিত অপেক্ষা করছেন। উত্তরের অপেক্ষা, ওদিকে স্বর্গীয় সুধামাখা সুরধ্বনির আওয়াজে মুখরিত মন্দির প্রাঙ্গন। ভাবে বিহ্বল উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। মীরার কণ্ঠ থেকে কি মধুমাখা সুরই না ধ্বনিত হচ্ছে। মীরা তন্ময় হয়ে গাইছে—

"মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরো না কোই"

কি অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি। রাজপুরোহিত আগেও দেখেছেন মীরাকে, কিন্তু আজকের মীরা যেন অন্য কেউ। এতরূপ এতো আগে কখনও দেখেননি তিনি। স্বর্গীয় সুষমা। দেবজ্যোতি ঝরে পড়ছে অঙ্গ থেকে। নির্নিমেষে সেদিকে চেয়ে থাকেন তিনি।

পায়ে পায়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছে মীরা। প্রবেশের সাথে সাথেই দুয়ার আপনিই রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধুই অপেক্ষা।

এতদিন মীরা প্রভুর কাছে কেঁদেছে। আজ তিনি কাঁদছেন। ভালবাসার সমুদ্র পার হয়ে তিনি এসেছেন পূর্ণতা দিতে। এ কান্না বিচ্ছেদের নয় মিলনের। এ অশ্রু ব্যাথার নয় আনন্দের। ওঃ একি আনন্দ। এত আনন্দও যে পাওয়া যায়, আনন্দ যে সর্বব্যাপী হয়ে যেতে পারে—এর আগে এমন করে কখনও মনে হয়নি।

আর কিছু চাইনা তার। কাউকে কিছু বলার নেই, পাওয়ারও নেই। এ অনুভূতি শুধুই নিজের।

দুহাত বাড়িয়ে রনছোড়জীকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যায় মীরা।

'এসো প্রভু, কাছে এসো। স্থান দাও তোমার শ্রীচরণদুটিতে আকুল হয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে সে। আর যে সময় নেই—বেলা বয়ে যায়। এবারও কি তবে ফিরিয়ে দেবে? আর যে দেরী সয়না।

রণছোড়জীর চরণে আলুলায়িত কুন্তলা মীরা। সময় চলে যাচ্ছে। ওদিকে দুয়ারে করাঘাত। রাজপুরোহিত ব্যস্ত হচ্ছেন।

কিন্তু একি? কি দেখছে মীরা?. সে কি শুধুই রনছোড়জীর পাথরের বিগ্রহ। সে কি মস্তকে শিখিপুচ্ছধারী, চরণে মঞ্জীর সম্বলিত বাঁশরী হাতে তার ভালবাসার গিরিধারীকে? না কি?

না কোথাও সে রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়নি। তার কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি কোথাও।

গভীর আবেগে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে মীরা, চির রহস্যময় সুন্দরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। অনন্ত সাগরের বুকে ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মীরা।

মুহূর্তে মিলিয়ে যায় অনন্তের বুকে। আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। চিরশান্তির আশ্রয় বিরহহীণ অনন্ত মিলন, চিরমুক্তি।

জ্যোতির দুয়ার অপাবৃত হয়ে চিরশান্তির নির্ঝরিনী ঝরে পড়ে—জ্যোতির অরুনিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত। মীরার চেতনা আজ লুপ্ত হয়েছে সেই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহের অব্যক্ত অফুরন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে।

বিশ্বরতির রসে রসায়িত হয়ে বিশ্ব আনন্দলীলার অখণ্ড সর্বব্যাপী চেতনায় অদ্বৈতানুভবের শাশ্বত সুরমূর্চ্ছনার অনাদি উদ্বেলনে। শাশ্বতী ব্রাহ্মী স্থিতিতে। সে চির রহস্যময় আনন্দলোক। চির অজ্ঞাত।

এর পরের রহস্য চির অজানা।

মীরা শব্দের অর্থে

ভারতবর্ষে 'মীরা' নামের বিশেষ মর্যাদা আছে। মীরা জন্মসাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া। ভাবসাধনার পথিকৃৎ। ডঃ পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন মীরা শব্দ ফারসী ভাষাসম্ভূত একটি উপনাম। ফারসী শব্দে 'মীর' বলতে অমীর অর্থাৎ সর্দারকে বোঝানো হয়। বহুবচনে তাই মীরা।

সংস্কৃত মীর শব্দ অনুসারে মীরা শব্দের অর্থ মহাসমুদ্র। কবীর মীরাবাঈর সমকালীন ছিলেন। কবীরের তিনটি দোঁহাতে মীরা শব্দ পাওয়া যায়। দোঁহার অর্থানুযায়ী মীরা শব্দের অর্থ কোনো 'সিদ্ধ ফকির' বা গুরু বোঝানো হয়েছে। ১৩৪৮ সালে লেখা বারহট বীটুজীর এক দোঁহায় 'মুতা নৈনসী' গ্রন্থে মীরা শব্দ পাওয়া যায়। অনেকের মতে মীরাবাঈর জন্মের সময় অলৌকিক জ্যোতি প্রকাশ পেয়েছিল বলে শিশুর নাম 'মহী' অর্থে পৃথিবী এবং ইরা অর্থে তেজ সংযুক্ত করে মহী+ইরা অর্থাৎ মীরা রাখা হয়। পণ্ডিত কেশবরাম কাশীরাম শাস্ত্রী 'কবিচরিত' গ্রন্থে 'মীরা' শব্দ মিহির অর্থাৎ সূর্য থেকে নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক মীরা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন

"মেড়্‌তিয়া ঘর জন্ম লিয়ো হ্যায়
মীরা নাম কহায়ো।"

"অর্থাৎ মেড়্‌তিয়ার ঘরে জন্ম নিয়েছি বলে আমার নাম মীরা।"

রাজস্থান ও মীরার পিতৃবংশের পরিচয়

রাজস্থানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল খর মরুভূমি। গ্রীষ্মের দাবদাহ মানুষকে উন্মাদ করে তোলে মৃত্যু ঘটায় আবার শীতকালে ঠাণ্ডার প্রকোপও বেশি। রাজস্থান

ক্ষত্রিয়দের রণভূমি ভারতের ইতিহাসে রাজস্থানের নাম সবার ওপরে। রাজপুত জাতির বীরত্ব ইতিহাস সৃষ্টি করে। রাজস্থানের আরেক নাম রাজপুতানা—ইতিহাস বলে রাজপুত্র থেকে রাজপুতানা নামের সৃষ্টি।

রাজপুতেরা নিজেদের সূর্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন। মেবারের রানারা লব এবং মারওয়াড়ের অম্বররাজারা নিজেদের কুশের থেকে উৎপত্তির পরিচয় দেন।

রাজস্থানের অধিবাসীদের কাছে শিবই প্রধান দেবতা হিসাবে পূজিত। শিবের উপাসকগণ সাধারণতঃ বিবাহ করেননা। তাদের গোস্বামী আখ্যা দেওয়া হয়। যোগীরাজ হারীত বাপ্পাদিত্যকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। হারীতের উপাস্য মূর্তিটির নাম ছিল একলিঙ্গ। বাপ্পাদিত্য 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' নামে পরিচিত হন। এই ভাবেই ক্রমান্বয়ে মেবারের অধিপতিরা 'একলিঙ্গকাদেওয়ান' (একলিঙ্গের প্রতিনিধি) এই উপাধিতে ভূষিত হতে থাকেন। রাজস্থানে শুধুমাত্র শৈব সম্প্রদায়ই নয়—জৈন ধর্মেরও কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। জৈনমতে যে পঞ্চ পর্বতের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আবু পালিখান গির্না রাজস্থানে অবস্থিত। চিতোর, আজমীর, বিকানীর সব জায়গাতেই জৈন মন্দির আছে। ইতিহাস বলে গিহেলাট বংশীয় আদি পুরুষই বল্লভীপতিরা আনহল বারাপত্তনের শেষ রাজা কুমার পাল প্রভৃতি রাজবংশীয়গণ জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

বৈষ্ণব মতেরও যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল সে সময় রাজস্থানে। রাণা রত্নসিংহের পিতা দুদাজী, মেবারের রাণাকুম্ভ ইত্যাদিরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রাজস্থানের বৈষ্ণব সাধনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন মীরা। তাঁর জীবনে বৈষ্ণব সাধু মাহাত্মাদের উপদেশ এবং প্রেরণা অন্তর্নিহিত প্রেম তৎকালীন বৈষ্ণব সাধনার দৃঢ় ভিত্তিরই পরিচয় বহন করে। নাথদ্বার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাতীর্থস্থান। রাজপুতানার বৈষ্ণব মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য শতশত বীর রাজপুত অক্লেশে প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন। নাথদ্বারে ভগবান শ্রীনাথজীর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা আছে যবন আক্রমণের আশংকায় বৃন্দাবন থেকে আগত শ্রীকৃষ্ণের রথ পথের মধ্যে শিয়ার নামক স্থানে মাটিতে বসে যায়। এক দৈবজ্ঞের কথানুযায়ী মহারাণা রাজসিংহ সেই স্থানেই প্রভুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানই নাথদ্বার নামে পরিচিত। শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দজীকেও এই একই কারণে জয়পুরে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় যোধপুরে অসংখ্য মন্দির তৈরি হয়েছিল। মুসলিমদের ভয়ে অনেক বিগ্রহই সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিক দিয়ে যোধপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলা যায়। জয়পুর, যোধপুরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্বার্ক শাখার প্রভাব বেশি। আজমীরের কিষেনগড়ে নিম্বার্ক তীর্থ বলেছেন নাথদ্বার কাংকরোলিতে বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এবং উদয়পুর, জয়পুরে মীরাবাঈয়ের মন্দির দেখা যায়। সমস্ত রাজস্থান জুড়ে আজও মীরাবাঈর কথাই মুখে মুখে ঘোরে। শত শত বছর পার হয়ে এসে মীরা আজও জনমানস আলোকিত করে নিজপ্রভাবে উজ্জ্বল অতুলনীয়া চরিত্র। তার রচিত গান

এখনও রাজস্থানের সবখানেই অতি আদরের সঙ্গে গীত হয়। রূপে, গুনে ভক্তি ও সাধনায় সমৃদ্ধ বিরল মীরা চরিত্র আজও ভারতবাসীর ভালবাসার ধন। যুগে যুগে কত সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাবে ভারতের মাটি ধন্য হয়েছে—সাধনার আবির্ভাবে কঠিন পথ উপক্রম করে অনেক সাধকই সিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু প্রেমের সাধনার পথ প্রথম উন্মুক্ত করেছিলেন মীরাবাঈ। তাঁর সাধনা ভাবসাধনায় যুক্তিতর্কের বালাই নেই। ক্ষুরস্যধারা নিশিথ দুরত্যয়া, দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই চিরসত্যকে উপলব্ধি করে গেছেন তিনি—

জীবনের শেষ প্রান্তে পেঁছে তাই লিখেছিলেন

যো মৈ এ্যায়সা জানতি
প্রেমকিয়ে দুখ হোয়।
নগর ঢিড়রা পিটাঁতি
প্রেম না কি জোই কোয়।

মারওয়াড় অধিপতি রাও রিনমলের পুত্র ছিলেন যোধাজী (১৪১৫ খৃঃ—১৪৮৮) তাঁর নিজ নামানুসারে যোধপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ১৯টি পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম দেওয়া হয় শৃঙ্গার দেবী। শিশোদিয়া বংশের মহারানা রায়মল্লের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মীরার ঠাকুর্দা রাও দুদাজী ছিলেন, রাও যোধাজীর ৪র্থ পুত্র। তিনি জালোরের সোনীগরা চৌহানরাজের কন্যা রানী চাঁদের গর্ভজাত সন্তান। রাও দুদাজী ১৪৪০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৬১ সালে তিনি পিতার আদেশে মেড়তা জয় করে সেখানে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে থাকেন। মেড়তার রাজবংশের সূত্রপাত ঘটে এই সময় থেকে। দুদাজীর দুই রানী ছিলেন। শিশোদিয়া বংশের চন্দ্রকুওর এবং চৌহানবংশীয় মৃগকুওর। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বড় ছেলে বীরমদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫২৫ সালে বীরমদেব তাঁর ভাই রত্নসিংহ (মীরার পিতা) কে নিয়ে রানা সাঁগা বা সংগ্রামসিংহের সাহায্যার্থে কনইয়া যুদ্ধে যান এবং বাবরের হাতে রত্নসিংহ নিহত হন। রত্নসিংহ বীর যোদ্ধা ছিলেন। ১২ খানি গ্রাম তিনি জায়গীর বাবদ প্রাপ্ত হন। রত্নসিংহ কুড়কী গ্রামে বাস করতেন, সেই খানেই মীরার জন্ম হয়।

কুড়কী রাজস্থানের একটি ছোট গ্রাম হলেও রত্নসিংহের প্রাসাদটির দিকে তাকালে আজও শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় মেলে। মীরাবাঈর মা ছিলেন ঝালা রাজপুত সুরতান সিংহের কন্যা বীর কুয়রী। মীরার জন্মেরও আগে তার এক ভাই জন্মায় নাম ছিল গোপালসিংহ কিন্তু সে বেশিদিন বাঁচেনি।

মেড়তা সিটি থেকে প্রায় ১৮ মাইল দূরে রীয়াঁ। সেখান থেকেও আট মাইল মরুভূমি অতিক্রম করে কুড়কী গ্রাম। কুড়কী মীরারই জন্মস্থান সে বিষয়ে মতবিরোধ না থাকলেও তাঁর জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। রাজস্থানের ঐতিহাসিক শ্রীসুখবীর সিংহ গহলৌত এবং মাদ্রাজের G. A. Meston ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মীরার জন্ম হয়েছিল বলেছেন। আবার—মীরাবাঈ কী পদাবলী

গ্রন্থের লেখক পরশুরাম চতুর্বেদী এবং "চতুরকুল চরিত্র"—মতে মীরার জন্ম ১৪৯৮ সালে। অনেক লেখক ও ঐতিহাসিক আবার মীরার জন্ম ১৫০৩ খ্রীঃ উল্লেখ করেছেন। যাই হোক সবকিছু বিবেচনা করে ১৪৯৮ সালেই যে মীরার জন্ম একথা স্পষ্ট অনুমান করা যায়।

চিতোরের রাজবংশের ইতিহাস

ভারত ইতিহাসে চিতোরের শিশোদিয়া বংশের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। রাণা লাখাজী ১৩৮২ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫ বছর রাজত্ব করে ছিলেন। তাঁর পুত্র মোকলজী ১৮৩৩ সালে এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। মোকলজীর পুত্র রানা কুম্ভ ১৪৬৮ সালে নিজপুত্র উদয়সিংহের হাতে নিহত হন। এরপর উদয়সিংহ আপন ভাই রায়মল্লের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। রায়মল্লের পুত্র সংগ্রামসিংহ ছিলেন মীরার শ্বশুর, ভোজরাজের বাবা। তিনি সাঁগা নামে পরিচিত ছিলেন। তিন ১৪৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৯ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহন করেন। শোনা যায় তাঁর স্ত্রী সংখ্যা ছিল আঠাশ, তাঁর সাতটি ছেলে ও চারটি মেয়ে ছিল। সাত ছেলের নাম ভোজরাজ, কর্ণসিংহ, রত্নসিংহ, বিক্রমজিত, উদয়সিংহ, পর্বতসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ। মেয়েদের নাম ছিল কুঁয়রবাঈ, গঙ্গাবাঈ, পদ্মাবাঈ এবং রাজবাঈ।

ভোজরাজ ছিলেন সংগ্রামসিংহের বড় ছেলে। তিনি ১৫০০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫১৬ খ্রীঃ মীরার সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মাত্র সাতবছরের বিবাহিত জীবন সমাপ্ত করে ১৫২৩ খ্রীঃ তিনি মারা যান। তখনও সংগ্রামসিংহ জীবিত। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র রত্নসিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৫৩১ খ্রীঃ রত্নসিংহ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছোটভাই বিক্রমজিত মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন। বিক্রমজিত অত্যাচারী স্বভাবের রাজা ছিলেন। প্রজাদের প্রতি এবং সর্বোপরি মীরার ওপরেও তিনি বহুভাবে অত্যাচার চালান। বিক্রমজিতের অত্যাচারের সুযোগে গুজরাটের বাহাদুর শাহ ১৫৩২ সালে চিতোর আক্রমন করেন। মহারানা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয়া স্ত্রী কারমেতন বাঈ-য়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। বিক্রমজিত তাঁরই বড় ছেলে। ছোটটির নাম উদয়সিংহ এবং কন্যা উদাবাঈ এই অবস্থায় রাণীকারমেতন বাঈ মোঘল সম্রাট হুমায়নের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। বাহাদুর শাহ চিতোর লুটপাট করে দেশে ফিরে যান এবং ১৫৩৫ সালে আবার আক্রমণ চালান। এবার রাজপুতরা পরাজিত হন এবং চিতোর বাহাদুর শাহর হাতে চলে যায়। কয়েকমাস পরে হুমায়ুনের সঙ্গে বাহাদুর শাহর যুদ্ধ হয় এবং পরাজিত হয়ে বাহাদুর শাহ গুজরাট পালিয়ে যায়। এই সুযোগে রাজপুতরা পুনরায় চিতোর উদ্ধার করেন।

মহারানা রায়মল্লের পুত্র পৃথ্বীরাজের জারজ সন্তান বনবীরকে সংগ্রাম সিংহ দয়া বশতঃ তাঁর সেনাবিভাগে উচ্চপদে স্থান দিয়েছিলেন। বনবীর ছিলেন স্বার্থান্বেষী

এবং সুযোগসন্ধানী। রতনসিংহের মামা মালদেবও বনবীরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। এদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিক্রমজিতের ছোট ভাই উদয় সিংহকে হত্যাকরে রতন সিংহকে সিংহাসনে বসানো। মহারানা সংগ্রামসিংহের জীবিতাবস্থায়ই মহারানার মধ্যমপুত্র রতনসিংহকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে রানী ধনবতীবাঈয়ের সহযোগীতায় তারা পরিকল্পনা করেছিল উদয়কে হত্যাকরে—উদাবাঈকে বন্দী করতে। তাদের সে পরিকল্পনা সফল হয়নি। মীরার একান্ত প্রচেষ্টায় সে যাত্রা প্রানরক্ষা হয় উদয় সিংহের। ধাত্রী পান্না নিজ সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে মেবারের রাজ সম্মান রক্ষা করেন। বহুদিন পর উদয়সিংহ কুম্ভলমের পেঁাছে সেখানকার সর্দারদের সহযোগীতায় পুনরায় হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৫৫৯ সালে উদয়পুরে নগর স্থাপন করে সেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭১ সালে উদয়সিংহ-মারা গেলে তার ছেলে প্রতাপসিংহ-মেবারের রাজা হন এবং লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। ১৫২৩ সালে ভোজরাজ মারা যান। ভোজরাজের মৃত্যুর সময় নিয়ে মতভেদ আছে। মীরাবাঈ গ্রন্থের লেখক অনাথ বসুর মতে ১৫২৮ সালের কিছু আগে ভোজরাজের মৃত্যু হয়। মীরা গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্যামপতি পাণ্ডে মৃত্যুর সময় ১৫২৭ খ্রীঃ অনুমান করেছেন। মীরামন্দাকিনী গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় ভোজরাজের মৃত্যু সময় ১৫২৬ খ্রীঃ। ভোজরাজের মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও মীরার বিবাহিত জীবন যে খুবই অল্পসময়ের জন্য ছিল সে ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ। মীরাকে অনেক জায়গায়—মহারানা কুম্ভের স্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

নরসীকামায়রী—গ্রন্থে মীরা স্বয়ং লিখেছেন তিনি মেড়তার ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা রাঠোর বংশোদ্ভূতা। মেবারের মহারানার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৪৬১খ্রীঃ থেকে ১৫৫৪ সালের মধ্যে মীরাবাঈয়ের জন্ম—কাজেই ১৪৬৮ সালে মৃত্যুপথযাত্রী মহারানা কুম্ভের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কের কথা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না।

রাও যোধাজীর কন্যা শৃঙ্গার দেবীর বিবাহ হয় রানাকুম্ভের পুত্র-রায়মলের সঙ্গে। কাজেই রাও যোধাজীর প্রপৌত্রী মীরার বিবাহ কোনমতেই কুম্ভের সঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। (মীরামাধুরী পৃঃ ৭৩)

১৪৫৮ সালে মহারানা কুম্ভের মৃত্যু হয় আর ১৪৭৪ সালে মীরার পিতা রতনসিংহের জন্ম হয়। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—মীরাকে কুম্ভের স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা নিতান্ত অযৌক্তিক। চিতোর পরিবারে প্রথমদিকে মীরা যথেষ্ট আদরনীয়া ছিলেন। মহারানা সংগ্রামসিংহের আঠাশটি বিবাহ ছিল। তাঁর সাত পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে—ভোজরাজ, কর্ণসিংহ, রত্নসিংহ ছিলেন রাও যোধাজীর প্রপৌত্রী রাণী ধনকুবেরের গর্ভজাত সন্তান। রত্নসিংহ মীরাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু ১৫৩১ সালে তিনিও মারা যান। কর্নসিংহ সংগ্রামসিংহের জীবিতাবস্থায়ই নিহত হন। কাজেই এদের সময় পর্যন্ত মীরাকে তেমনভাবে কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এরপরই বিক্রমজিতের সময় থেকে মীরা অত্যাচারিত হতে থাকেন।

মীরাবাঈ ও ব্রজধাম

১৫৩৫ সালে মীরার পিতৃব্য বীরমদেবজী মীরাকে চিতোর থেকে মেড়তায় নিয়ে যান। ('মীরা'-শ্যামপতি পাণ্ডে)

ভোজরাজের মৃত্যুর পর ১৩ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে ১৫২৩ খ্রীঃ গুজরাটের বাহাদুর শাহ প্রথমবার চিতোর আক্রমণ করেন। ১৫৩৪ খৃঃ দ্বিতীয়বার আক্রমণের ফলে চিতোর পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মীরা সে সময় বিক্রমাজিতের অত্যাচারে মেবার ত্যাগ করে মেড়তায়—অবস্থান করতে থাকেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি নানা কারণে মেড়তা ত্যাগ করে ব্রজধামে চলে যান। অনুমান করা যায় তখন ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ।

মীরাবাঈর বৃন্দাবন আগমন সম্পর্কে "মীরাবাঈ গ্রন্থ প্রণেতা স্বামী বামদেবানন্দ লিখেছেন—"ব্রজবিহারীলালের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন ধামের কথা মীরা বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছেন কিন্তু সেখানে যাইবার কোন সুযোগ হয় নাই। এবার তিনি ধীরে ধীরে সুমধুর কণ্ঠে গিরিধারীলালের জয়গান করিতে করিতে বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথিত আছে রাখালবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মীরার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মীরা যে স্থানেই যাইতেন অপূর্ব ভাবাবেগে সে স্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। জানি না কি মোহিনী শক্তির আকর্ষণ ছিল যার জন্য এত লোক একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বৃন্দাবনে মীরা আসিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। রাস্তা ঘাট বন উপবন যেখানে যান শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর স্মৃতিই জাগিয়া উঠত। তাহার মুহূর্মুহু ভাব সমাধি হইতে লাগিল। তিনি আপন অস্তিত্ব যেন একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। কথিত আছে এই সময় তিনি ভাবাবেশে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন। যমুনার তীবে শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলিতেছেন। ব্রজ গোপীদের সঙ্গে বনবিহাব করিতেছেন—মীরা ভাবাবেশে সজল নয়নে দাঁড়াইয়া সেই সুমধুর দৃশ্য দেখিতেছেন। তাহার আগমনে বৃন্দাবন যেন অল্পদিনেই নবরূপ ধারন করিল। মীরার কথা শুনিয়া চারিদিক হইতে বহু ভক্ত তাহার সুমধুর কণ্ঠে-সঙ্গীত শুনিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিরে অফুরন্ত উৎসবানন্দে বৃন্দাবনবাসী মত্ত হইয়া উঠিল।"

বৃন্দাবনে পৌঁছে মীরা যে প্রধান তিনটি মন্দির দর্শন করেছিলেন তার বিবরণ মীরাবাঈর "নরসী জী রো মাহেরো" গ্রন্থে পাওয়া যায়।

১। মাই ম্যানে লাগে বৃন্দাবন নীকো।
ঘর ঘর তুলসীঠাকুর পূজা দরশন গোবিন্দ জী কো॥

২। নিপট বংকট ছবি অটকে—মেরে নৈনা।
দেখত রূপ মদনমোহন কোপিয়ত পিয়ূখনভটকে॥

৩। হমরো প্রণাম বাঁকে বিহারী কো।

মহ ছবি দেখি মগন ভই মীরা মোহন গিরিবরধারী কো ॥

মীরা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজী বঙ্কবিহারী ও মদনমোহন মন্দির দর্শন করেন। নিচে মন্দিরগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল—গোবিন্দজীর মন্দির।

শ্রীরূপ গোস্বামী ১৫৩৪ খ্রীঃ যোগপীঠ বা গোমাটীলা নামক স্থানে শ্রীগোবিন্দজীর মূর্তি প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি একটি মন্দির স্থাপনা করে পূজা করতে থাকেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপচন্দ্রের পুত্র রাজা পুরুষোত্তম শ্রীরূপ গোস্বামীকে রাধারানীর একটি মূর্ত্তি প্রেরণ করেন। সেই থেকে ঐ মন্দিরে যুগলমূর্ত্তির পূজা শুরু হয়। ঐ মন্দিরই শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির। মীরা বৃন্দাবনে এসে ঐ মন্দিরই দর্শন করেন। মন্দিরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর ১৫৮৮ খ্রীঃ অম্বররাজ মানসিংহ কর্তৃক মন্দিরটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ঔরঙ্গজেবের সময়ও মন্দিরটির প্রচুর ক্ষতি সাধিত হওয়ায় রাজা রাজসিংহ গোবিন্দজীকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করেন। ১৫৯১ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি মানসিংহ লালপাথর দিয়ে মন্দিরটিকে নতুন করে তৈরি করার সময় সম্রাটের কাছ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান পাথর সাহায্য হিসাবে পেয়েছিলেন। ১৮৭৩ খৃীঃ মথুরার কালেক্টর মিঃ গ্রস ৩৮ হাজার টাকা খরচ করে মন্দিরটির সংস্কার করে বর্তমান রূপ দিয়েছেন।

বঙ্কবিহারীজী—

স্বামী হরিদাস এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। হরিদাসের জন্ম হয় ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ—১৩৮৪ খৃীষ্টাব্দে। ২৫ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন। নিধুবনে তিনি বঙ্কবিহারীজীর মূর্ত্তি পান। সেই থেকে আজও এর পূজা সমানেই চলে আসছে।

মদনমোহন-শ্রীসনাতন এবং রূপ গোস্বামী একই সঙ্গে ধর্মপ্রচারের জন্য বৃন্দাবনে আসেন। ১৫৩৩ খৃীঃ আদিত্যটীলায় শ্রীমদনমোহনজীর মূর্তি পেয়ে মাঘমাসের দ্বিতীয়া তিথিতে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অনেক মন্দির আছে। মীরা নিশ্চয়ই সবই দর্শন করেছিলেন। তবে তিনি তাঁর রচনাতে বিশেষ করে এই তিনটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করায় মন্দির তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

মীরার দ্বারকাগমন ও অন্তর্ধান

বৃন্দাবনে মীরাবাঈ বেশিদিন থাকেন নি। এর কারন অজানা। কৃষ্ণপ্রিয়া মীরার শেষ জীবন কাটে দ্বারকায়। এর গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা সহজ নয়। "মীরা জীবনী আউরকাব্য" গ্রন্থে জানা যায় ১৫৪৩ খৃীঃ মীরা বৃন্দাবন ত্যাগ করে দ্বারকায়

গমন করেন। মীরামাধুরী গ্রন্থে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। সঠিক সময় না জানা গেলেও উপরোক্ত দুটি সময়ের কাছাকাছিই যে তিনি দ্বারকা চলে যান সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দ্বারকাধাম গুজরাটে অবস্থিত। সেখানকার ভাষা আয়ত্ত করে তিনি গুজরাটী ভাষায় বহু ভজন রচনা করেছিলেন। 'মীরামাধুরী' গ্রন্থে ১৪২টি ভজনের উল্লেখ আছে।

মীরা মেবার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়। ১৫৩৮ খ্রীঃ উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন। উদয়সিংহ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। মীরাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন।

'মীরাবাঈকী শব্দাবলী'—গ্রন্থে পাওয়া যায় উদয়সিংহ মন্ত্রীদের পরামর্শানুযায়ী রাজপুরোহিতকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন মীরাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। মীরা কিছুতেই স্বদেশে ফিরতে রাজী হননি। কিন্তু বার বার যখন মীরাকে একই অনুরোধ করা হতে লাগল তখন মীরা খুব বিপদে পড়লেন। ওদিকে পুরোহিত আহার নিদ্রাত্যাগ করেছেন। বাধ্য হয়ে মীরা রনছোড়জীর কাছে আশ্রয় নিলেন।

রাজপুরোহিত অপেক্ষারত। ওদিকে মীরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। মন্দিরের বন্ধদুয়ার কিছুতেই খোলে না। বহুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর—সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। অবশেষে মন্দিরদ্বার উম্মুক্ত করা হল দেখা গেল সেখানে মীরা নেই। মন্দির নিস্তব্ধ। সকলেই হতবাক। দরজা তো বন্ধ ছিল তবে মীরা গেলেন কোথায়? দরজার সামনে পুরোহিত এবং অগণিত দর্শনার্থী। কারো সামনে দিয়েই তিনি কোথাও যাননি। কিছুক্ষণ আগেও সকলে মীরার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি শুনেছে তাহলে এরই মধ্যে কি হল? বিস্মিত উপস্থিত জনগন। কারো মুখেই কথা সরছেনা। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। অবশেষে দেখা গেল রনছোড়জীর মুখে মীরার ওড়নার একটি টুকরো লেগে রয়েছে। সকলেই এবার আসল রহস্য বুঝতে পারলেন। মীরা কোথাও যাননি তিনি রনছোড়জীর সঙ্গেই মিলিত হয়েছেন। তিনি দেহত্যাগ করেননি। তাঁর পঞ্চভূতের দেহসমেতই তিনি বিলীন হয়েছেন অনন্তের মধ্যে। চিতোরগড়ের সন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলেছেন এখনও দ্বারকায় রনছোড়জীর মন্দিরে নিত্যই প্রভুকে শয়ন দেবার সময় মুখে বস্ত্রখণ্ড লাগিয়ে রাখা হয়।

মীরার অন্তর্ধানের সময় সম্পর্কে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। যোধপুরের রাঠোর ভাট মীরার অন্তর্ধানের সময় ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ বলেছেন। চতুরকুল চরিত্রে, মীরামাধুরী গ্রন্থে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথাই বলা হয়েছে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ১৫৬৩—১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মীরার অন্তর্ধানের কথা উল্লেখ করেছেন। এইভাবে নানা সময় নানা ব্যক্তির মতানুযায়ী সঠিক সময় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। সময় সম্পর্কে সংশয় থাকলেও সত্য সত্যই। তাকে অস্বীকার করা যায় না। চিরন্তন সত্য নিহিত রয়েছে মীরার মহান আদর্শের মধ্যে তা নেই সন বা তারিখে॥

মীরার সময়কার ঐতিহাসিক ধারা

খ্রীষ্টাব্দ		বিষয়
১৩৯৫	—	মারওয়াড় রাজ্য স্থাপন
১৪১৫	—	যোধাজীর জন্ম
১৪৪০	—	দুদাজীর জন্ম
১৪৬১	—	মেড়তা রাজ্য স্থাপন
১৪৭৪	—	রতনসিংহের জন্ম (মীরার পিতা)
১৪৮১	—	রানা সাঁগার জন্ম
১৫০০	—	ভোজরাজের জন্ম
১৫০৩	—	মীরার জন্ম
১৫১৬	—	মীরার বিবাহ
১৫২৩	—	ভোজরাজের মৃত্যু
১৫২৭	—	রতনসিংহের মৃত্যু
১৫৩১	—	বিক্রমজিতের সিংহাসন লাভ
,,	—	বাহদুর শাহর চিতোর আক্রমণ
১৫৩২	—	মীরার মেবার ত্যাগ
১৫৩৫	—	শ্রীজীব গোস্বামীর বৃন্দাবন আগমন।
১৫৩৬	—	বিক্রমজিতের মৃত্যু।
১৫৩৮	—	উদয়সিংহের সিংহাসন লাভ
১৫৩৮	—	মীরার বৃন্দাবন গমন
১৫৪৬	—	মীরার দেহত্যাগ

মীরার পিতৃবংশ তালিকা

রাও চূড়াজী
জন্মকাল ১৩৭৭, রাজত্বকাল ১৩৮৩—১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দ

হংসকুমারী

রাও রিড়মল
জন্ম ১৩৯২ । ১৪২৩—১৪৩৮

রাও যোধজী
জন্ম ১৪১৫ । ১৪৩৮—১৪৮৮

রাও দুদাজী
১৪৪০—১৫১৫

রাও সাতলজী
১৪৮৮—৯১

সুজাজী
জন্ম ১৪৩৯
রাজা ১৪৯১—১৫১৫

শৃঙ্গার দেবী

রাও বাঘাজী
জন্ম ১৪৫৭
মৃত্যু ১৫১৪

গাঙ্গাজী
রাজা ১৫১৫—১৫৩১

রাও মালদেব
রাজা ১৫৩১—১৫৬২

রায়মল
জন্ম ১৪৭৪—১৫২৭

বীরমজী
জন্ম ১৪৭৭—১৫৪৩

জয়মল
১৫০৭—১৫৬৭

রত্নসিংহ
জন্ম ১৪৭৪—১৫২৭

মীরা
১৫০৩—১৫৪৬

চিতোরের রাণার বংশ তালিকা

রাণা ক্ষেত্রসিংহ
রাকা ১৩৬৪—৮২

- রানা লাখা=হংসকুমারী
  রাকা ১৩৮২—৯৭
  - রানা মোকল
    জন্ম ১৩৯২, রাকা ১৩৯৭—১৪৩৩
    - রানা কুম্ভ
      জন্ম ১৪১৮, রাকা ১৪৩৩—১৪৬৮
      - রানা রায়মল্ল=শৃঙ্গার দেবী
        রাকা ১৪৬৮—১৫০৯
        - রানা সাংগা=ধনাবাঈ
          রাকা ১৫০৯—১৫২৮
          - পদ্মাবতী
          - ভোজরাজ=মীরা
          - রত্নসিংহ
            ১৫২৮—৩১
          - বিক্রমজিৎ
            ১৫৩১—৩৬
          - উদয়সিংহ
            ১৫৩৮—৭১
            - প্রতাপসিংহ
              ১৫৭১—১৫৯৭
      - রমা দেবী
    - লালবাঈ=অচল সিংহ

সাধক রুইদাস

সাধক রুইদাস ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৫40 খ্রীষ্টাব্দে মাঘ শুক্লা পূর্ণিমাতে কাশীধামে তাঁর জন্ম হয়। বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থে পাওয়া যায় যে পূর্বজন্মে তিনি সাধক রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। ঠাকুরের ভোগসামগ্রী সংগ্রহের জন্য শিষ্যটিকে গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হত। প্রত্যেক বাড়ী থেকে অর্ধমুষ্টির বেশি ভিক্ষা নেওয়া গুরুর নিষেধ ছিল। এইভাবে ত্রিশ মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করা প্রতিদিনকার কাজ ছিল। একদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে শিষ্যটি সেইস্থানের এক বণিকের স্ত্রীর কাছ থেকে ত্রিশমুষ্টি ভিক্ষা করে আশ্রমে ফিরে আসেন। প্রতিদিনকার মতই ভোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সর্বনাশ। রামানন্দ দেখলেন সেদিন ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করলেন না এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল, যে বণিকের স্ত্রীর কাছ থেকে সেদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই বণিকটি শুদ্ধসওয়ার ছিল না—ফলে ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেননি। রামানন্দ প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠলেন এবং শিষ্যটিকে বললেন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও তুমি যেহেতু চামারের মত আচরণ করেছ তাই এরপর তোমাকে চামারের ঘরেই জন্ম নিতে হবে এবং যে ত্রিশমুষ্টি অন্নের জন্য তোমার এত দুর্ভোগ আগামী ত্রিশবছর অপেক্ষা করে সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারলে তবেই হবে শ্রীরামচন্দ্র দর্শন। নচেৎ নয়। এই বলে শিষ্যটিকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করে দেন রামানন্দ।

কথিত আছে শিষ্যটি পরে নিজ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ঐ শিষ্যটিই পরজন্মে চামারের গৃহে রুইদাস রূপে জন্ম নেন।

এদিকে রামানন্দ-র শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা। রুইদাসকে চিনে বার করার জন্য তিনি প্রতি মুচি ঘরেই যাওয়া আসা শুরু করেছেন। কেবলই ভাবেন কবে সে আসবে? এভাবেই দিন কাটে। একদিন সন্ধান পেলেন এক চামারের গৃহে এক শিশুর জন্ম হয়েছে সে শুধু কাঁদে—কিছু খেতে চায় না। রামানন্দ কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়ে শিশুটিকে দেখেই চিনতে পারলেন যে এই শিশুটিই তার পূর্বজন্মের শিষ্যছিল যাকে তিনি বিতাড়িত করেছিলেন। তবু সন্দেহবশতঃ শিশুর পিঠ দেখলেন রামানন্দ। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন। দেখলেন পিঠে তারই পদাঘাতের ছাপ জাজ্বল্যমান। আর কি আশ্চর্য রামানন্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে যেন কতকালের চেনা। পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন রামানন্দ। এতদিনে তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। যে এসেছে বড় হয়ে সে-রুইদাস নামে সাধক হবে—উদ্ধার করবে—অনেককে—একথা আগে থেকেই জানতেন তিনি। সবই প্রভুর লীলা। না হলে এমন ঘটনাই বা ঘটল কেন? রামানন্দ তো উপলক্ষ্য মাত্র। আজ বড় নিশ্চিন্ত হলেন রামানন্দ। তাঁর কাজ এতদিনে শেষ হয়েছে। দিন যায়।

ওদিকে শিশুটির পূর্বজন্মের স্মৃতি সবই মনে পড়েছে। বাবা মাকে সবকথা জানিয়েছে। কিন্তু এজন্মে যেহেতু চামারের ঘরে জন্ম সেহেতু ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুপদে অনুরক্ত হলেও নিজবৃত্তি চর্মকারের কাজ করেই তিনি সংসার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করলেন।

গাছতলায় বসে আপনমনেই তিনি ভজন করেন আর নিজের কাজ করতে থাকেন। সাধুসন্ত দেখলেই তাদের পায়ের ধুলো নেন।

একবার স্বয়ং বিষ্ণু-রুইদাসকে পরীক্ষার জন্য ছদ্মবেশে তাঁর কাছে আসেন। একটি পরশপাথর রুইদাসের কাছে রেখে সাধুবেশে তিনি তীর্থভ্রমণে চলে যান। রুইদাসের কোনো বিষয়ে আসক্তি ছিলনা। পরশপাথরটি তিনি সযত্নে তুলে রেখে দেন এবং সাধুজীর ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকেন। কথামত দীর্ঘ ১৩ মাস পরে শ্রীবিষ্ণু সাধুজীর বেশ ধরেই পুনরায় তার কাছে আসেন। রুইদাস সে পরশমণি প্রয়োগ করেনি জানতে পেরে তিনি তার নির্লোভ চরিত্রের জন্য তাকে আশীর্বাদ করেন এবং পরে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দান করে যান। স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে রুইদাস খুশি না হয়ে বিরক্তই হন কারন অর্থ পাছে ঈশ্বর সেবা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করে দেয় এই আশঙ্কায় তিনি সদাই শঙ্কিত থাকতেন। একদিন রাতে ভগবান স্বপ্ন দিয়ে তাকে আদেশ করেন যে তার নিজের জন্য অথবা দেবসেবার্থে ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি যেন ব্যয় করা হয়। রুইদাস ইষ্টআজ্ঞায় এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শালগ্রাম শিলা স্থাপনা করেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ছিল প্রচণ্ড। তারা চামারের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। সকলে মিলে রাজার কাছে একযোগে অভিযোগ জানালেন। রাজা রুইদাসকে শালগ্রাম ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। তখন রুইদাস বললেন "আমার একান্ত বাসনা—মহারাজার সামনে শালগ্রামশিলা ব্রাহ্মণরা গ্রহন করুন।" রাজা সম্মতি দিলে ব্রাহ্মণরা সকলেই শালগ্রামকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হল। কেউই সক্ষম হলেন না। তখন রুইদাস আপনমনেই প্রভুর লীলা দেখে করুন সুরে ভজন গাইতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা সকলেই হতবাক। কেউই শালগ্রামকে স্থানচ্যুত করতে পারেন নি। সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় হঠাৎ সকলের চোখের সামনেই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ভক্তবাঞ্চা কল্পতরু ভক্তাধীন ঈশ্বর স্বয়ং-ই সেই শালগ্রামরূপে রুইদাসের কোলের মধ্যে এসে পড়লেন। রাজা বিস্মিত। উপস্থিত প্রজাবৃন্দ সকলেই রুইদাসের জয়ধ্বনি করতে লাগল। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণেরা সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। এরপর থেকে আপনমনে সাধনা করে গেছেন রুইদাস। তার সাধনায় কেউ বিঘ্ন ঘটায়নি।

চিতোরের রানী ঝালী রুইদাসের শিষ্যা ছিলেন। এক যজ্ঞানুষ্ঠানে সকলেই নিমন্ত্রিত। গুরু রুইদাসও উপস্থিত। তাকে যজ্ঞ উপলক্ষে উপস্থিত দেখে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা সকলে পাকঅন্নগ্রহণে আপত্তি জানালেন। সকলেই স্বহস্তে রান্না করবেন এই স্থির হল। স্বহস্তে রান্না করে যখন ব্রাহ্মণেরা খেতে বসেছেন তারা দেখেন যে

প্রতি দুজনের মধ্যে একেক জন রুইদাস বসে আহার করেছেন। রুইদাসে যোগবল দেখে সকলেই বিস্মিত? প্রত্যেকেই তখন লজ্জা বোধ করছেন। এরপর তারা রুইদাসের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

রুইদাস সাধু সন্ত দেখলেই তাদের সেবায় নিয়োজিত হতেন। ভক্তমাল, হরিভক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থে রুইদাসের বিষয়ে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'গ্রন্থসাহেব'-গ্রন্থে-রুইদাসের কিছু বাণী লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী বৈষ্ণব। অলখ নিরঞ্জনের পূজারী। তাঁর রচিত এক ভজনে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণ করিম রাম রহিম হরি জব
লাগি এক ন পেখা
বেদ কিতাব পুরানাণি তব লাগি
ভ্রম হি দেখা।

যতক্ষণ তুমি কৃষ্ণ করিম, রাম ও রহিমকে অভেদ না দেখবে ততক্ষণ বেদে, কোরানে,ও,পুরানে ভ্রমই তোমার নজরে আসবে।

আরেকটি ভজনে তাঁর ভক্তির পরিচয় মেলে—

প্রভুজী, তুম চন্দন হম পানি।
যাকী অঙ্গ অঙ্গবাস সমানী ॥
প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা।
যৈসে চিতবত চন্দ চকোরা।
প্রভুজী তুম দীপক হম বাতি।
যাকী জ্যোতি বরৈ দিনরাতি ॥
প্রভুজী তুম মোতি হম্ ধাগা।
যৈ সে সুনহী মিলিত সুহাসা।
প্রভুজী তুম স্বামী হম দাসা।
ঐ সী ভক্তি করৈ রুইদাসা ॥
হে প্রভু…তুমি চন্দন আর আমি জল।
তোমার সুগন্ধ আমার সারা শরীরে লিপ্ত
হয়ে আছে। হে প্রভু, তুমি গহন অরণ্য
আর আমি প্রেমোন্মত্ত ময়ূর। তুমি প্রদীপ
আর আমি বাতি। তোমার আলোতে
আমার অন্তর সদাই আলোকিত।

হে প্রভু, তুমি মোতি আর আমি সুতো। তুমি সোনা, আমি সোহাগা। তুমি স্বামী আমি দাস। এইভাবে রুইদাস তোমাকে ভক্তি করে।

ক্রুকস সাহেব 'The North Westernprovince of India—'গ্রন্থে লিখেছেন যে রুইদাসের শিষ্যপরম্পরা রামানন্দ বা কবীর পন্থীদের পরবর্তী। রুইদাস সম্প্রদায় উত্তরভারতে বিশেষ প্রভাবশালী। এখনও সেখানে মুচিজাতীয় কোন লোককে

নাম জিজ্ঞাসা করলে নামের শেষে রুইদাস শব্দ তারা উচ্চারণ করে থাকে। রুইদাস ১২০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনিই ছিলেন মীরার গুরু। তাঁর সম্পর্কে মীরা লিখেছেন—

"খাড়ি খাড়ি য়ে পন্থ নেহারু,
মরণ কোঈ জানী।
সদ্‌গুরু ঐসা ঔষধ দীনী,
রোম রোম ভরো চৈনা ॥
নহি মে পিহর সাসর রে,
নহি পিয়াজীকে পাস।
মীরা নে গোবিন্দ মিলিয়ারে,
গুরু মিলিয়া রুইদাস দাস ॥

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আমি জীবনপথ নিরীক্ষণ করছিলাম। দেখলাম আমার মর্ম কেউ জানেনা। সদগুরু এমন ঔষধ দিলেন যে প্রেমাবশে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হল। আমি পিতা শ্বশুর বা পতির কাছে থাকি না ইষ্টদেব গোবিন্দ ও সদগুরু রুইদাসকে পেয়েছি।

রুইদাসের কৃপায় মীরা ধন্য হয়েছিলেন। চিতোর গড়ের 'মীরাবাঈ'-মন্দিরের সামনে রুইদাসজীর পায়ের চিহ্ন আজও বর্তমান।

প্রাচীন ভারত (বৈদিক যুগ)

পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী। উত্থান পতন, সংহার ও সংরক্ষণের মধ্যেই এর সজীবতা লুকিয়ে আছে। নতুনত্বের স্বাদে সে অনন্যা নিত্য পরিবর্তন তার বুকে জোয়ার ভাটার মতো খেলা করে। সর্বংসহা ধরিত্রী সহ্য করে অবলীলায়। প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। তাই প্রকৃতির লালিত এই মানুষও পরিবর্তনের আলো ছায়া সহ্য করেই বেড়ে উঠেছে। মেনে নিয়েছে তার খামখেয়ালীপনা। প্রকৃতির দুর্নিবার আহ্বানকে সে উপেক্ষা করতে পারেনা—পারে না মুখ ফিরিয়ে নিজেকে গৃহাবন্দী করে রাখতে। প্রকৃতির স্পন্দন ধ্বনিত হয় তারই বুকে—একাত্ম হয়ে যেতে হয়।

প্রাচীনকালে মানুষেরই প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ। ছন্নছাড়া গৃহহীন মানুষ পেয়েছিল ঘর বাঁধার স্বাদ। কিন্তু সেখানেও দেখা দিল নতুন সমস্যা। চিরন্তন না পাওয়ার খেদ—মানুষের অন্তরকে করলো জর্জরিত। সমাজের বুকে আলোড়ন উঠল আবার এলো পরিবর্তনের ঢেউ। কিন্তু এ যন্ত্রণার প্রতিষেধক কি? চিন্তাশীল মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মুক্তি চাই—চাই অমৃতের আস্বাদ। কিন্তু কিভাবে? অবশেষে অনেক প্রচেষ্টায় অমৃতের বাণী এসে পৌঁছাল মানব দুয়ারে। রহস্যের উদ্ঘাটন হলো। অমৃত আস্বাদন করে মানুষ হলো অমৃতময়।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টি"—রাগ (আসক্তি) থেকেই সৃষ্টি বিরাগ থেকেই যোগ। (সাংখ্য প্রবচন সূত্র ২ অ। ৯।)। সৃষ্টি মানেই বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য কিন্তু সীমাবদ্ধ। তাই মোক্ষ বা মুক্তিলাভের উপায় হল এর বাইরে যাওয়া। সর্ব বন্ধন থেকে মুক্তি। সৃষ্টিতে যা কিছু দেখা যায় সবই প্রাণের কম্পনে নিঃসৃত হয়েছে। যাঁরা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা অমর হন। (কঠ ৩। ২।)

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।

ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ত তো বিজুগুপ্সতে।

এতদ্বৈতৎ॥ (কঠ ২। ১। ১২।)

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষরূপে শরীর মধ্যে অবস্থান করেন—তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এইরূপ দর্শন হলে লোক নিজেকে রক্ষা করার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা॥

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রাচীন ভারত অনেক আগেই তা উপলব্ধি করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সনাতন হিন্দুধর্মই সর্বপ্রথম পরিপুষ্টি লাভ করে। এবং ঋগ্বেদই এই ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। ঋক অর্থে মন্ত্র। বৈদিক শব্দার্থবোধক শাস্ত্রকার যাস্কের মতে "যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাহারই নাম মন্ত্র"—মন্ত্রাঃ মননাৎ। মন্ত্রকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ঋক, যজু ও সাম। বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক ধরণের মন্ত্রকে এক এক স্থানে সংহত করে—তিনটি গ্রন্থাকারে বিভক্ত করলেন। এবং বাকি মন্ত্রগুলি অথর্ববেদে যুক্ত হল। বেদব্যাস বেদের বিভাগ করেছিলেন, রচনা করেননি। তিনি বেদকে ভাগ করে নিজ শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন। বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আবার অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের ফলে গুরু কর্তৃক পরিত্যাজ্য হন এবং যে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা প্রকাশ করে ফেলেন। অবশ্য পরে উপাসনা দ্বারা সূর্যদেবকে তুষ্ট করে পুনরায়—তা গ্রহণ করেন। সেই বেদই শুক্লযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকাশিত বেদের নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ। বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যরা তিতির পক্ষীরূপে ঐ প্রকাশিত বেদকে পুনর্গ্রহন করেছিলেন বলে তাকে তৈত্তিরীয় নামেও আখ্যা দেওয়া হয়।

ঋক, সাম যজুঃ একই সুরে ঐক্যতান তুলেছিল বলে এদেরকে ত্রয়ী নামেও উল্লেখ করা হয়। অনেকে ভাবেন অথর্ববেদ 'ত্রয়ী' বহির্ভূত। কিন্তু আসলে তা নয়। অথর্ববেদে যজ্ঞের ব্যবহার নেই বলেই তাকে ত্রয়ীর মধ্যে ফেলা হয় না—এতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রত্যেক বেদেই দুটি করে ভাগ আছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র ভাগের এক নাম সংহিতা। অর্থাৎ যাতে মন্ত্রসমূহ সম্-হিত বা একত্রে স্থাপন করা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ ভাগে থাকে বিধি, নিষেধ, যাগ যজ্ঞঃ উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। এরই অংশকে বলা হয় আরণ্যক। আরণ্যকেও প্রচুর উপাসনা আছে। প্রধানতঃ তা ছিল অরণ্য বাসীরই অবলম্বনীয়। অরণ্যবাসীর পক্ষে যাগযজ্ঞ করা কষ্টসাধ্য থাকায় তাঁরা ধ্যান ও উপাসনার মাধ্যমেই সাধনা করতেন। বেদের প্রতি শাখায় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ ছিল। উপনিষৎ

শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। অর্থাৎ যে বিদ্যালাভ করলে সংসারবন্ধনকে শিথিল করা যায়—সেই বিদ্যা। উপনিষদের অন্য নাম বেদান্ত।

আর্য ঋষিরা শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমেই—মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন জ্ঞান ছাড়া—উপলব্ধি ছাড়া ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। কারন জ্ঞানই মুক্তির পথপ্রদর্শক। এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয়েছে বেদের আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগে।

উপনিষদের সংখ্যা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন সময়—বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গ্রন্থ রচনা করে তাকে উপনিষৎ নামে সমাজে প্রচলিত করার চেষ্টা করেন। সম্রাট আকবরের সময়ও 'অল্লোপনিষৎ'—রচিত হয়। তাই এর প্রামান্য লাভ সহজসাধ্য নয়। তবু বলা যায় প্রধান বারোখানি উপনিষদের নাম—

ঋগ্‌বেদীয়—(১) ঐতরেয়—
(২) কৌশীতকী—
সামবেদীয়—(৩) ছান্দোগ্য—
(৪) কেনোপনিষৎ—
কৃষ্ণযজুর্বেদীয়—(৫) তৈত্তিরীয়—
(৬) কঠোপনিষৎ
(৭) শ্বেতাশ্বতর—
শুক্লযজুর্বেদীয়—(৮) বৃহদারণ্যক
(৯) ঈশ—
(১০) প্রশ্ন—
(১১) মুণ্ডক—
(১২) মাণ্ডুক্য—

বাকী সবই অথর্ববেদীয়। উপনিষদে ছিল আধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার। উপনিষৎ ঘোষণা করল "আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো। মন্তব্যো নিধিদ্যাসিতব্যঃ।"

অর্থাৎ আত্মাকে দেখ, শোনো, মনন কর এবং ধ্যান কর। উপনিষদের এই জ্ঞান মার্গ থেকে এল যোগমার্গ। যোগমার্গে পতঞ্জলি ঋষির অবদান অসামান্য। সাংখ্যদর্শন জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন দর্শনশাস্ত্র। জগতের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র বা সমস্ততত্ত্বের মূলে এই সাংখ্যদর্শন।

পাইথা গোরাস—(জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৫৮২-cir 582 B. C)

ভারতে এসে সাংখ্যতত্ত্ব শিখে গিয়ে গ্রীকদের শেখান। তাঁরও আগে থেল্‌স্‌ (Thales born circa 640 B. C. খৃঃ পূঃ ৬৪০) এবং পরে সক্রেটিশ (খৃঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯) ও ষ্টোয়িক জিনো (Zeno the Stoic—খৃঃ পূঃ ৩৫০—২৫৮) প্রভৃতিরা একে একে এদেশে এসেছেন এবং সাংখ্যতত্ত্ব শিক্ষা করে ফিরে গেছেন।

সাংখ্য প্রকৃতিকে 'সংজ্ঞামাত্রম' বলেছেন। (সাংখ্য প্রসূ ১ম/৬৮)। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি অব্যক্ত। পুরুষও প্রকৃতি উভয়ই সমান। তফাৎ এই যে পুরুষ 'অবিকারী'

প্রকৃতির বিকার হয়। প্রকৃতিই আদি কারন। সাংখ্য মতে পুরুষ কখনো কারন হতে পারে না।

সাংখ্যমতে পুরুষ অসংখ্য—প্রতি অবয়বে অধিষ্ঠান করছেন। প্রত্যেক পুরুষই অনাদি, অনন্ত ও চৈতন্যময়। কার্য মানে 'বিকার'—কিন্তু পুরুষ 'অবিকারী'। সাংখ্য এই পর্যন্তই বলেছেন। এর পরের কথা বলেছেন। অদ্বৈতবেদান্ত। তাই পরের স্তরে অদ্বৈতবেদান্তর সঙ্গে সাংখ্যের বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এখানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়—প্রথমতঃ সাংখ্য 'উপাধি' যোগে—'পুরুষের' গতি স্বীকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু গতি মানেই বিকার। উপাধি মানেই বহুত্ব। এক্ষেত্রে উপাধি এবং গতি বিশিষ্ট বহু পুরুষ 'প্রকৃতিতে' প্রত্যক্ষ। কিন্তু পুরুষ অপারিনামী। সাম্যাবস্থায় কোন বিকার নেই অর্থাৎ অব্যক্ত পুরুষের বিকার হয় না। পুরুষকে এই বিকারহীন অবস্থা থেকে মুক্ত করা প্রকৃতির কার্য। পুরুষের সংস্পর্শেই প্রকৃতির ক্রিয়া। সৃষ্টি কার্যকরী করতে হলে চাই পুরুষ এবং প্রকৃতি। সাংখ্য বলছেন পুরুষও প্রকৃতি এই দুই থাকলেও মুক্ত পুরুষের কাছে প্রকৃতির নিবৃত্তি ঘটে। দ্বৈতভাব সম্পর্কে সাংখ্য ঐ পর্যন্তই বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা বলেছেন অদ্বৈতবেদান্ত। স্বামীজী তাঁর (Vedanta & Sankhhya)—গ্রন্থে বলেছেন, সাংখ্য যে সৌধ তৈরি করেছেন তাতে চুণ, বালি ধরিয়েছেন অদ্বৈতবেদান্ত। সাংখ্যের মতে 'প্রকৃতি ও পুরুষ'—এই দুয়ের মধ্যে একের প্রতি উদাসীনতাই 'মুক্তি'। পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যজ্ঞানই সাংখ্যের মূল কথা। সাংখ্যের এই মতবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'ডারউইন' এবং 'স্পেনসার' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের Evolution Theory-র সামান্য মিল লক্ষ্য করা যায়।

যোগমার্গের পর আসে ভক্তিমার্গ। ঐতিহ্যের উদ্দেশ্য জীবন ও নানাপ্রকার প্রসঙ্গের সাহায্যে চিরন্তন উপলব্ধি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বেদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোথাও ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেদান্তে আছে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। এই নির্গুণ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষ ধরতে ছুঁতে পারে না। সেজন্য ক্রমবিবর্তনের ফলে সাধারণ মাধ্যম হিসাবে 'প্রতীক'—এর উৎপত্তি হল। সে অনেক পরের কথা। এখন বৈদিক যুগের কথাই ধরা যাক্।

ঋগ্বেদের সবখানেই আছে অতি উচ্চমানসিকতার পরিচয়। ঋগ্বেদাদিতে প্রথমে ক্ষাত্রশক্তির পরিচয় মেলে পরে ক্ষাত্রশক্তি থেকে ব্রহ্মণ্যশক্তির বিকাশ লক্ষ করা যায়। সে যুগের সমাজজীবন থেকে এগুলির প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে ঋষি যোদ্ধা এবং যুদ্ধ পারদর্শিনী ঋষিপত্নীর কথাও মেলে। সে সময় গুণ ও কর্মেরই প্রাধান্য ছিল তাই সমাজস্থিতির জন্য প্রধানতঃ গুণকর্মানুযায়ী বর্ণ বিভাগ হয়। সে যুগের প্রথম দিকে গুণকর্মানুসারে নামকরণ পর্যন্ত হত না। পরে গুণ ও কর্ম আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য নামকরণ' হয়। সমাজজীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় বংশের বিশেষ ধারা বজায় রাখার জন্য বংশ হিসাবে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে আরণ্যক যুগে। তাহলেও সে সময় গুণগত কর্মেরই প্রাধান্য ছিল বেশি। এই সময় থেকেই জনশক্তি এবং সমাজশক্তির উদ্ভব হয়। নানাপ্রকার ভাব এবং মতবাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল

মানুষ কি উপায়ে বন্ধনমুক্ত হতে পারে। ভারত প্রথমেই বুঝেছিল সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ। তাই সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রত্যেক মানুষই যেন সাহসী এবং সৎ হয়ে ওঠে এই ছিল ঋষিদের কাম্য। তাঁরা আদর্শ জীবন চাইতেন যাতে প্রকৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে—সচ্চিদানন্দকে উপভোগ করতে পারা যায়। তখনকার সামাজিক নিয়ম সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট ছিল না। সে যুগে 'আচার'—কে ধর্ম বলে গণ্য করা হত না। ধর্ম লাভ করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন তাই এক একটি শিক্ষা পদ্ধতির নাম ছিল সংস্কার। যারা ঐসব সংস্কারকে মানতেন না তাদের বলা হত অনার্য্য। সংস্কার-গুলির উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করা—পবিত্রতার উন্মেষ ঘটানো। তার বিপরীত 'আচার'-কেই বলা হত 'কুসংস্কার'। বৈদিক যুগে গুণকর্মানুসারে জাতি বিভাগ ছিল বলে একই পরিবারে কেউ হয়ত ব্রাহ্মণ এবং অন্যজন ক্ষত্রিয় বিবেচিত হত। ব্রহ্মবিদ্যা সে সময় থেকেই গুপ্তবিদ্যা হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্র পড়ে বা আলোচনা করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না এবং সে কারণেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও পরবর্তী যুগে তপস্যা করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হয়। বৈদিক যুগে যে কোন ভাবধারাকেই মর্যাদা দেওয়া হত। কোনো একটা আদর্শকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে অন্য কাউকে হেয়—প্রতিপন্ন করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। ঋষিরা বুঝেছিলেন "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—একই নানারূপে ব্যক্ত। তাই সংকীর্ণতা এবং ভেদমূলক সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা কখনও প্রশ্রয় দেননি।

'অদিতি'-ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন শব্দ। অদিতি—মানে অখণ্ড, আবার অদিতিকে মাতা অর্থে সমগ্র সৃষ্টিকে বোঝানো হত। যা জাত তাও অদিতি। যা জন্মাবে তাও অদিতি। অদিতি (স্ত্রীশক্তি)-চিৎ রূপিনী অদিতি থেকেই—জাত সব বস্তুই আদিত্য। তার মধ্যে সূর্য প্রধান। আদিত্য বলতে তাই আমরা—সূর্যকে বুঝি। যারা প্রথম—অখণ্ড বিশ্বমাতার কল্পনা করেছিলেন—প্রথম বিশ্বশক্তিকে মাতৃরূপে অনুভব করেছিলেন তারাই ছিলেন উপনিষদবক্তা। জগৎকে নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে জন্ম ও জন্মের কারন বলে ব্যাখ্যা করে নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞানবিতরণ করে গেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার সে ধারা এইভাবেই প্রবাহিত হয়ে ভারতকে নতুন বলে বলীয়ান করেছে—নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছে।

বৈদিক ভাবধারার সাথে যুক্ত থাকলেও দ্রাবিড়রা বেদ চর্চা ত্যাগ করায় পতিত হল। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৩। ৫৩। ১৪) 'কীটক' নামে যে দেশের নাম পাওয়া যায় তা মগধেরই প্রাচীন নাম। ঐ স্থানে এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তরবঙ্গে) অনার্য-ভাবের প্রাধান্য ছিল। আদি আর্যদের মধ্যে বাঙালীরাও ছিলেন। তাদের গতিবিধি বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের 'পক্ষী' জাতি নামে অভিহিত করা হত। দেবী ভাগবত ও পুরাণের নানা স্থানে দেখা যায়—'পক্ষী'-জাতির-জ্ঞান দেখে সকলেই আশ্চর্য বোধ করেছেন। কাজেই তাদের অনার্য্য মনে করার কোন কারন নেই।

এভাবেই শুধু ভারতে নয়, ভারতীয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর নানা

প্রান্তে। ভারতই সর্ববিষয়ে পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। যারা শাস্ত্রের প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী তাদেরকে বলা যায় সব দেশের সাহিত্য, ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ভারতেই প্রথম সভ্যতার উদয় হয়েছিল। যখন অন্যান্য স্থান মনুষ্যহীন—তখন ভারতই আধ্যাত্ম চর্চায় রতও দেবজ্ঞান পরিপূর্ণ।

বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম তার নিজ ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে এবং মানুষের অগ্রগতির পথে সহায়ক হয়েছে। এ ধর্ম শাশ্বত। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে ভারতের ধর্ম আন্দোলনের পরিচয় মেলে। যুগে যুগে ধর্ম আন্দোলন ঘটেছে। ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে। নামহীন সেইসব সাধকের প্রচেষ্টার—কীর্তি আজও ভাস্বর। আধ্যাত্মিকতায় ভারতের স্থান এখনও সবার শীর্ষে।

হিন্দু জাতি ও সনাতন ধর্ম

আর্য মতে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত। যেমন—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এবং শাল্মলী। এক একটি দ্বীপ আবার কিছু অংশে বিভক্ত। ঐ সমস্ত অংশকে বর্ষ বলা হয়। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে চন্দ্রবংশীয় ভরত রাজত্ব করেছিলেন তাই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। এই ভরতের পিতা ছিলেন ঋষভ দেব। ঋষভের একশত ছেলে ছিল তার মধ্যে ভরত-ই শ্রেষ্ঠ। পুরানমতে ভারতবর্ষ অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই তিন ভাগে বিভক্ত।

হিন্দুরা ভারতের আর্যজাতি। কারো কারো মতে হিমালয় ও বিন্দু সরোবর এই দুই শব্দের শুরু ও শেষ অংশ ধরে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কারন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগেই হিন্দুদের বাস। অনেকের ধারণা আর্যরা প্রথমে মধ্য এশিয়ার বাস করতেন। কালক্রমে তাদের বংশবৃদ্ধিতে স্থান ও খাদ্যের অভাবে তাদের দুই সম্প্রদায় নূতন বাসস্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। এক অংশ পশ্চিমে ইউরোপে বসতি স্থাপন করেন এবং অন্য সম্প্রদায়—দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়ে পাঞ্জাবের সীমান্তে উপস্থিত হন। এই স্থানে আবার দুটি দল ভাগ হয়ে যায়। একদল পারস্যে এবং অন্য দল হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমস্থ গিরিসঙ্কট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এই শেষোক্ত দলটি সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পারসীকরা সিন্ধু শব্দটিকে হিন্দু—উচ্চারণ করত। এজন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত হয়ে যান। হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নয়। প্রাচীন কোন ধর্মশাস্ত্রে ঐ শব্দটি কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দু শব্দটি পুরোনো পারসিক ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু এবং পারসিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করলে বোঝা যায় হিন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর। পারস্যের কীলরূপা শিলালিপিতে 'হিদুস্'—শব্দটি লিখিত আছে।

ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম বলতে সনাতন ধর্মকেই বোঝানো হয়। হিন্দুধর্মকে বৈদিক বলা হয় এই কারণেই যে এই ধর্ম বেদপ্রতিপাদ্য—এবং একে সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলা হয়। এই কারণেই অনাদিকাল থেকে পিতাপুত্র ও গুরু শিষ্যপরম্পরায়

এই ধর্মের অনুশীলন হয়ে চলেছে। বেদ ও বেদানুকুল শাস্ত্রের উপর যাদের আস্থা নেই—বেদোদ্দিষ্ট পথকে যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করেন না তারা কোনমতেই 'হিন্দু' পদবাচ্য নন। নিজেকে যিনি হিন্দু মনে করবেন তাকে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে বেদাদি শাস্ত্র অনুসারে তিনি নিজেকে কতটা পরিচালিত করতে পারছেন। বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবানেরাই হিন্দু। এই ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করতে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন।

'চোদনালক্ষ্যনোর্থোধর্ম্মঃ' অর্থাৎ চোদনা বা বেদই যাতে একমাত্র লক্ষণ তাই ধর্ম। মহর্ষির বক্তব্য অনুযায়ী ধর্মে বেদই একমাত্র প্রমাণ—অন্য কোন প্রমাণ নেই। কারণ বেদ অপৌরুষে। ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে শক, হুন, বৌদ্ধ, জৈনদের দুর্দণ্ড—প্রতাপে হিন্দুধর্ম সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও দীর্ঘকাল ধরে এর প্রভাব থাকে নি। যুগে যুগে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হিন্দু ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। ঐতিহাসিকরাও এ বিষয়ে একমত। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয় সেজন্য বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থকেই আমরা ধর্মের প্রমাণরূপে—গ্রহণ করতে পারি না। তবে মনু—প্রভৃতি ঋষিবৃন্দের রচিত বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ এবং বেদব্যাস রচিত পুরাণ ও ভাগবতাদিকে সত্য মানার সপক্ষে যুক্তি এই যে তাঁরা সকলেই যেহেতু বেদবিদ ছিলেন তাই তাদের লিখিত গ্রন্থের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে না। ঐসব ঋষিগণ বেদবিদ না হলে কখনোই ত্যদের কথা প্রমাণরূপে গৃহীত হতো না। মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্টই বলেছেন 'বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যংস্যাৎ, অসতি হ্যনুমানম্'। যেখানেই বেদের বিরোধীতা পাবে সেখানেই স্মৃতিবচনকে—অপ্রমাণ বলে মেনে নিতে হবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যকার সুখ লাভ কখনোই সম্ভব নয়। ধর্ম যেহেতু বেদপ্রতিপাদ্য সেহেতু মানুষের মঙ্গলকারীও বটে। জগতে যতপ্রকার দুঃখ আছে সবই অধর্মজাত। তাই মানুষমাত্রেরই ধর্ম পালন করা অত্যাবশ্যক। ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক—বা রাজনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়।

এই সনাতন হিন্দুধর্মকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রবৃত্তিধর্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম। যে ধর্মের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ ঐহিক সুখের জন্য করা হয়ে থাকে তাকে প্রবৃত্তিধর্ম বলে। আর যেগুলির মূল উদ্দেশ্য হল ভগবৎ প্রেম লাভ সেগুলিকে নিবৃত্তিধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড—এই তিনটি ভাগের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিধর্মের বিধান পাওয়া যায়। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদি কর্মের বিবরণ থাকায় সেটি কর্মকাণ্ডের, আরণ্যকে উপাসনাবিধির প্রাধান্য থাকায়—সেটি, উপাসনাকাণ্ডের এবং উপনিষৎ ভাগে জ্ঞানের প্রাবল্য থাকায়—সেটি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

শাস্ত্রসম্মত কর্মগুলিরও তিনটি ভাগ আছে। যথা নিত্য—নৈমিত্তিক ও কাম্য। যা না করা অন্যায় তাই নিত্যকর্ম। যেমন বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনা ইত্যাদি। শাস্ত্রকে অবলম্বন করে সময় বিশেষে যা অবশ্যপালনীয় তাই নৈমিত্তিক। যেমন শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি। আর যেসব কর্ম কামনার সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তাই কাম্যকর্ম।

যেমন পূজা, ব্রত ইত্যাদি। ভক্তি, যোগ এগুলি উপাসনার অন্তর্ভুক্ত। এই উপাসনাকেও তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতিতে আছে "আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মাকে শ্রবণ, ও নিদিধ্যা-সনরূপ উপাসনাদ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করা কর্তব্য। এই আত্মসাক্ষাৎকারই জ্ঞান।

বেদ মানুষের স্তরভেদে এবং সামর্থ্যানুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপদেশ দিয়েছেন সত্য—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ইষ্টমন্ত্রজন, ভগবৎভক্তি প্রভৃতি সাধারণ অবশ্য পালনীয় নিয়মের মধ্যে পড়ে। তবে এখানেও তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। সন্ন্যাসীর পক্ষে অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য যেরূপ অবশ্য পালনীয় গৃহস্থের পক্ষে ততটা নয়। গৃহস্থের কাছে বিধিনিষেধগুলি ততটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এইভাবেই ধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে অধিকারীভেদে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। না হলে কারো পক্ষেই মানা সম্ভব হত না কারন সুখ জগতে একপ্রকার নয়। প্রত্যেক মানুষের চাওয়া পাওয়া ভিন্ন। এজন্যই হিন্দুধর্মকে সার্ব্বজনীন ধর্ম বলা হয়। একই নিয়ম প্রত্যেকের উপর কার্যকরী করতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অকল্যাণ হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৩০ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা আছে।

যিনি গন্ধ রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগ দ্বেষ করেন না কীর্ত্তি ও সম্মানলাভের জন্য চেষ্টা করেন না, তিনি ব্রাহ্মণ। কেবলমাত্র বেদাধ্যায়ন, গুরুসেবা ও ব্রহ্মচর্য পালন করলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াশীল, বেদের মর্ম উপলব্ধি করে মৃত্যুকে জয় করতে পারেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

অপরোক্ষ জ্ঞান "সোহং"—আমিই সেই ভগবান, যখন জীব থেকে পরোক্ষ—অর্থাৎ ভিন্ন তখন তুমিই ভগবান 'তত্ত্বমসি' এই দুই জ্ঞানের উপর আর্য হিন্দুধর্মের ভিত্তি। ধর্মের উপাসনার সূত্রে মহাভারতে শান্তিপর্বে মহাত্মা ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে বলছেন যে বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় সংযম ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। ভোগ বাসনায় জিহ্বায় সরস্বতী, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি ও চরণে বিষ্ণু রয়েছেন। এই চতুর্ব্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—বলে বিবেচিত। ব্রাহ্মণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষাদান করেন। ক্ষত্রিয়—দণ্ডধারণ করে—জগতকে শাসন করেন। বৈশ্য ঈশ্বরের অগ্নি নির্বাপিত করেন। এবং শূদ্র এই তিনটি সত্তার অভাব পূরণ করে এবং বিষ্ণুর ক্ষমতা স্বীয় চরণের উপর নির্ভর করে সমস্ত কাজ করে, কারো সাহায্য নেয় না।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয় তখনই যখন কোন গুণবান প্রকৃতি ও পুরুষের দৃঢ় আকর্ষণে মহৎপুরুষ মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন। এই জন্য বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে ঈশ্বর বলেন। যে সময় মহাত্মা বেদব্যাস পুত্রস্নেহে ব্যাকুল, যখন দ্রুপদরাজা রাজকর্তব্য পালনে রত ও উপাসনায় ব্রতী, যখন পাণ্ডবগণের সবে জন্ম হয়েছে ঠিক তখনই কংসের কারাগারে দেবকীনন্দন বাসুদেবের জন্ম। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন বলেই শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় গোপীহৃদয়ের বিশুদ্ধ বাসনায় তিনি প্রকাশিত।

যুগ বিভাগ ও সৃষ্টি রহস্য

হিন্দুশাস্ত্রমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগকে একত্র করলে দেবতার এক যুগ হয়। এইরকম একাত্তর—দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। এই রকম চোদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। এবং ব্রহ্মার দিবসানুযায়ী মাসও বছর গণনার দ্বারা যে একশত বছর হয় তাই ব্রহ্মার পরমায়ু।

মানুষের যুগবিভাগ করা হয়েছে এইভাবে—

১। সত্যযুগ বা দেবমানব ঋষি যুগ—স্থিতিকাল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বর্ষ

২। ত্রেতা বা মানব দেব ঋষিযুগ—,, ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বর্ষ

৩। দ্বাপর বা মানব ঋষিযুগ—,, ৮ লক্ষ ৬৪ ,, ,,

৪। কলি বা বর্তমান যুগ—৪৩ লক্ষ ২২ ,, ,,

সৃষ্টির পূর্বাবস্থা সম্পর্কে শাস্ত্র বলেছেন তপস্যায় সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু যখন তপস্যামগ্ন তাঁরা এক আশ্চর্য জ্যোতি দেখতে পেলেন। ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করে সেই স্তম্ভাকৃতি জ্যোতির ঊর্দ্ধে যেতে চেষ্টা করলেন। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে ঐ জ্যোতিস্তম্ভের নিচের দিকে চললেন। উভয়েই একসময় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরে এলেন। অন্ত পেলেন না। পুরানাদিতে ঐ জ্যোতিস্তম্ভই অনাদি লিঙ্গ। ঐ লিঙ্গ থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি।

এও বলা হয়েছে যখন কারনার্নব ছাড়া আর কিছু ছিলনা তখন ব্রহ্মা দেখলেন মধু, কৈটভ নামে দুই দৈত্যের আবির্ভাব হয়েছে। যোগনিদ্রামুক্ত জনার্দন সেই কারন সাগর থেকে গাত্রোত্থানপূর্বক দেখলেন দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। বিষ্ণু তখন তাদের বিনাশ করেন। দেবীভাগবতমতে অসুরদ্বয় মারা যাওয়ার পর তাদের মেদদ্বারা কারন সমুদ্র পূর্ণ হয়ে গেল। এবং ভূপৃষ্ঠ জেগে উঠল। সেইজন্যে পৃথিবীর আরেক নাম মেদিনী। মধুবধের জন্য বিষ্ণুর আরেক নাম মধুসূদন। এইটি দ্বিতীয় অবস্থা।

হিন্দুশাস্ত্রে অন্ততঃ বারোবার প্রলয়ের কথা আছে। পুরানে সমুদ্র মন্থনের কথাও রয়েছে। বলা হয় সেই সময় চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন উত্তপ্ত পিণ্ড ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকার সময় ক্রমান্বয়ে মৎস্য কুর্ম-বরাহ এবং সবশেষে তৎকালীন আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বশতঃ খর্বকায় মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। পুরানের দশাবতার রহস্যের উৎপত্তি—এখানেই। কাজেই বলা যায় তৎকালীন বিজ্ঞানে এই ক্রমপরিবর্তনের অভিজ্ঞতা না থাকলে (যা আজ লুপ্ত) সৃষ্টিরহস্য এভাবেই বর্ণিত হত কিনা বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানের—মতানুযায়ী সমুদ্রেই প্রথম জীবন চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর বয়স হিসাবে বিভিন্ন যুগ ভাগ করে কালকে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। আদি অবস্থার নাম ছিল—Azoic—এজোয়িক

২। প্যালিওজোয়িক (Paloeozoic)

এরই উপযুগ ক) ক্যাম্ব্রিয়ান (Cambrian) মেরুদণ্ডহীন জীব

খ) সাইলুরিয়ান (Silurian)

গ) ডেভোনিয়ান (Devoniun)

ঘ) কার্বোনিফেরাস (Carboniferous) মৎস্য

ঙ) পারমিয়ান (Permian) উভচর জীব

৩। মেসোজোয়িক (Meszoic)

উপযুগ—ক) ট্রায়াসিক (Triassic)—সরীসৃপ

খ) জুরাসিক (Jurassic)

গ) ক্রিটেকিয়াস (Cretaceous)

৪। সাইনোজোয়িক (Cinozoic)

উপযুগ—ক) Eocene (স্তন্যপায়ী) ইয়োসিন

খ) Oliogocene (অলিওগোসিন)

গ) মাইওসিন (Miocene)

ঘ) প্লিওসিন (Pliocene)

৫। নিয়োজিক Neozic

ক) Pleistocene (প্লিসটোসিন) মানুষ

খ) বর্তমান যুগ

ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের আগে ছিল গলিত প্রস্তর। সালুরাইন যুগে বিছা, স্পঞ্জ ইত্যাদি প্রাণীর উদ্ভব হয়। মেসোজোয়িক যুগে বৃহৎ আকারের সরীসৃপ জাতীয় জীবের উৎপত্তি। সাইনোজোয়িক যুগে সমুদ্র উদ্বেলিত হওয়ায় পর্বতের উত্থান হয়। এই সময় থেকেই স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টি। এর পরবর্তী যুগ থেকে প্রায় সব আকারেরই জীব দেখা যায়। মাইওসিন যুগে বানরের উৎপত্তি। এর পরেই আসে হিমযুগ। ইউরোপের ৮০ হাজার বর্গ মাইলভূমি এই সময় অদৃশ্য হয়ে যায় ভূগর্ভে। এবং সমুদ্রের তলদেশ উচ্চ হয়ে ওঠে। সে সময়ও মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তবে সে শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে।

দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ, ভারত ও মাদারগাস্কার নিয়ে যে ভূভাগ ছিল তার নাম ছিল Gondwana Land গেণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড)। ঐ ভূভাগের সঙ্গে 'দক্ষিণ আটলাণ্টিস' নামে এক মহাপ্রদেশের মধ্য দিয়ে (এমন যেখানে আটলাণ্টিক মহাসাগর) দক্ষিণ আমেরিকার যোগাযোগ ছিল এখনও পর্যন্ত জানা গেছে, প্রবল ভূকম্পনের ফলে পার্শ্বস্থিত ভূস্তরের চাপে হিমালয়ের সৃষ্টি। তখন মাইওসিন যুগ। মাইওসিনস্তরের গঠন হতে সময় লাগে ৬০ লক্ষ বছর। যাই হোক ভূতত্ত্ব এখনও তার শেষ সীমায় আসেনি। হিমালয়ের উত্থান বা প্রাণসৃষ্টির রহস্য নিয়ে যতই তর্ক বিতর্ক চলুক না কেন সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় সর্ব স্থানেই প্রকৃতির আপূরণ চলেছে। ক্রমোন্নতি বা—ক্রমাবনতি যেভাবেই ধরা যাক্ পরিবর্তনশীলতাই মূল কথা। Electron, Atom বা Molecule যে বিপরীতক্রমে Molecule Atom এবং পরিশেষে Election হতে পারে না একথা জোর দিয়ে বলা চলে না। সে শিল্প সহায়ে আধ্যাত্মশিল্পী সবখানেই সেই চৈতন্যকে উপলব্ধি করেন সেই একই

শিল্প মাধ্যমে চৈতন্যই মানবশরীরে নেমে এসে প্রকাশিত হন। কাজেই শক্তির রহস্য উন্মোচন করা দুঃসাধ্য। শক্তির ক্রমারোহন এবং ক্রমাবরোহন এ দুইই সম্ভব।

সৌর শক্তি ও সাধনা

The Tibetan Book of the Dead—By W. Y. Evans Wentz—বই থেকে সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যায়। সৃষ্টির পূর্বে তেজোময় দীপ্তি (Fire Mist) সর্বত্রই ঘূর্ণমান অবস্থায় ছিল। দ্বিতীয় স্তরে ঐ তেজ থেকে বায়ু পৃথক হয়ে—তাকে আবরিত করল। তৃতীয় স্তরে—বায়ুদ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘূর্ণমান অগ্নি কিছুটা শান্ত হয়ে বাষ্পাকার ধারণ করল এবং—ধোঁয়ার আকার (vapour gas) নেওয়াতে 'অপ'-এর উদ্ভব হল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ু, জল—এর উৎপত্তি হওয়ায় দেখা যায় বর্ত্তমান অবস্থাতেও বায়ু, জল অগ্নিকে সাম্যাবস্থায় রাখতে পারে। এই অগ্নি থেকেই পঞ্চমভূত ক্ষিতির প্রকাশ। সাধককে আসনে বসে মানসপূজাকালে পঞ্চভূত সমর্পণ করতে হয়। ভূত পাঁচটি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

ক্ষিতির লক্ষন (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)
অপ-এর লক্ষন (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস)
তেজ „ „ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ)
মরুৎ „ „ (শব্দ, স্পর্শ)
ব্যোম „ „ (শব্দ)
অপ রস প্রধান। মরুৎ বা বায়ু স্পর্শ প্রধান।

ব্যোম বা আকাশ শব্দগুনযুক্ত। ক্ষিতি—গন্ধ প্রধান। ক্ষিতিকে পৃথ্বীও বলে তবে স্থূল অর্থে। এইভাবে অপ এর অর্থ জল ধরা হলেও সেটিও স্থূল। আগুন তেজ-এর স্থূলপ্রকাশ। মরুৎ-এর স্থূলপ্রকাশ বাতাস।

ঐসবগুলির সূক্ষ্মাবস্থার নাম তন্মাত্রা।

এ প্রসঙ্গে সাংখ্য বলেছেন যে উপাদানে মন তৈরি হয়েছে তারই স্থূল অবস্থা তন্মাত্রা এবং তন্মাত্রার স্থূলই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

জগৎ ক্রিয়ার প্রধান সন্ধিক্ষণ তিনটি। প্রাতঃ—মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। সূর্যই প্রাণ-শক্তির উৎস। আদিত্যই প্রাণ।

সুপ্রাচীনকালেও আর্যভট্টর মত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদকেও সূর্যকে "বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম তন্মূর্ত্তি পুরুষঃপরঃ" বলে তার সর্ব্বব্যাপীত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। তাঁর কথানুযায়ী সূর্য 'অব্যক্ত'—সর্ব্বাতীত পুরুষ, শান্ত ছন্দরূপে ইনিই বেদে হিরণ্যগর্ভ। আবির্ভূত হলে আদিত্য। দুপুরের সূর্যই হলেন বিষ্ণু। পালনী শক্তির প্রকাশ। ভারতের আধ্যাত্মচিন্তা বরাবরই অখণ্ড-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এ সত্য উপলব্ধি করতে হলে চাই একাত্মতা।

বৈদিক গ্রন্থে বলা হয়েছে ছন্দের একাদশ অক্ষরই সূর্যের গতি। পৃথিবীর উত্তর দিকে স্থলভাগ বেশি থাকায় পৃথিবী ঐদিকে একটু হেলে থাকে—তার ফলে

যুগভেদে নক্ষত্রদের অবস্থিতিও বদলাচ্ছে।

শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। বর্তমান যুগ বলছে এই সৌরমণ্ডল আরেকটি বৃহত্তর সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আর সেটি কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি নক্ষত্র। বিষ্ণুপুরান বহু আগেই সূর্যের দ্বাদশ অবস্থার কথা বলেছেন। সূর্যের দ্বাদশ অবস্হা বলতে কিন্তু দ্বাদশটি পৃথক সূর্যের কথা বলা হয় হয় না। সূর্যের বিভিন্ন অবস্হারই ইঙ্গিত দেওয়া হয় মাত্র।

সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুই সূর্য। আমরা জেনেছি বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে মৎস্য কিন্তু সাধারণ জলচর জীব ছিলনা। রাত্রে আকাশে যে ছায়াপথ লক্ষিত হয় সেই ছায়াপথই পুরানে ঋষিকুল্যা, স্বর্ণদী মন্দাকিনী প্রভৃতি নামে পরিচিত। ছায়াপথটি গোল হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করে থাকে। একারণেই তার নাম 'কৃতমালা নদী'। অগ্নিপুরান থেকে জানা যায় এই নদীতে তর্পনকরার সময় মনুর হাতের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য ধরা পড়ে। এই মৎস্যই (ছায়াপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিকনা) বিষ্ণুর প্রথম অভিব্যক্তি। ঐ ছায়াপথ থেকেই কোটি কোটি সূর্যের জন্ম। এক কথায় ঐ দীপ্ত জ্যোতির্মণ্ডলই কেন্দ্রবিদু। জ্যোতিপ্রবাহ যার মধ্যে দিয়ে প্লাবিত হয় তাই মেরু। বিশ্ব কুণ্ডলিনীর পথ। মানুষের দেহে তাই সুষুম্না বা ব্রহ্মনাড়ী।

সুষুম্নার মধ্যেই সকলচক্র অবস্হিত। কুণ্ডলিনীর উত্থানে সাধক মাত্রেই চক্রের রহস্য পরিজ্ঞাত হন। তখন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আপন আপন ভাব অনুযায়ী তারা এগিয়ে যান লক্ষ্যের দিকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

ব্রহ্ম যে এক এবং অদ্বিতীয় তা সমস্ত উপনিষদে স্বীকৃত। যোগীর কাছে যিনি পরামাত্মা ভক্তের কাছে তিনিই ভগবান। অনন্তশক্তির আশ্রয় এবং স্বরূপশক্তির সত্তাই ভগবদসত্তা।

বেদান্তবাদীর মতে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা তিনিই ভক্তের ভগবান। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি না থাকায় ব্রহ্ম প্রথমে নিষ্ক্রিয় এবং পরে স্বরূপশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকায়—তিনিই ভগবান। গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায়—"যোগীর ইষ্টদেব হৃদয়ে নিহিত কিন্তু তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিতে হইলে যোগশক্তি অপেক্ষা আরও অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। যোগী দর্শন পায় স্বপ্নবৎ ধ্যানের মধ্যে, ভক্ত পায় সাধারণ জাগ্রত ভাবের মধ্যে। তাই ভক্তের অনুভূতিতে যে তৃপ্তি তাহা যোগীর অনুভূতিতে আশা করা যায় না।"

"ভক্তির বিষয় ভগবান। ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবে ভগবান আবির্ভূত হন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৃত্তি রোধ করিতে হয়না।—ভাবের অঞ্জন মাখাইয়া দিলে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবানের আস্বাদন লাভ করা যায়। যোগীর দর্শন হয় অন্তরাকাশে। ভক্তের দর্শন হয় বাহিরাকাশে। ভক্ত প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারাই ভগবদদেহের

অনুভূতি প্রাপ্ত হন—কিন্তু যোগীর ইষ্টানুভূতি সেরূপ হয়না।" (শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ পৃঃ ১৬)

শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের পুরান পুরুষ। তিনি স্বয়ং ভগবান। কর্ষনাৎ 'কৃষ্ণ'—অর্থাৎ যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। তিনিই সর্বাবতারের বীজ। তিনি অব্যয়। এই কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে হলে ভগবদ তত্ত্ব বোঝার আবশ্যকতা আছে। আর ভক্তিতত্ত্বের বিকাশেই ভগবদ তত্ত্বের স্ফূর্তি বিকাশ ঘটে। ভগবদতত্ত্বের স্ফূর্তি হলেই কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়—আর একমাত্র প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তির দিব্যনেত্রেই সেই পরমধন শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ নিরীক্ষণ করা সম্ভব। কৃষ্ণ মায়াধীশ এবং জীব মায়াবশ। ব্রজলীলায় যে সমস্ত রূপ, কার্য ও ভাব বর্ণিত হয়েছে তা সমস্তই অপ্রাকৃত। অদ্বয় প্রেমতত্ত্ব ব্রজলীলায় শক্তি ও শক্তিমান ভেদে রস বিস্তার করেছে। সে কারণেই স্থান ও কালের সীমায় সমস্তই রসময় হয়ে উঠেছে। মাধুর্যাত্মক যে নিয়মের ধারা সৃষ্টিতে বর্তমান তারই ঘনীভূত রূপ শ্রীকৃষ্ণ।

সাধনভজন কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হয়ে গেলে তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। ধর্মশাস্ত্র শুধুমাত্র পথেরই সন্ধান দেয়—তাই পথিক মাত্রেরই তা অবশ্য পালনীয়। কিন্তু যে আর পথিক নয়—যার যাত্রা শেষ হয়ে গেছে তার আর পথের উপদেশের কোন প্রয়োজন থাকেনা। যেমন ছিলেন মীরা। ভাবসাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনা করে তিনি আজও সারা বিশ্বের কাছে নিদর্শন-স্বরূপ হয়ে আছেন। তিনি নমস্য।

জ্ঞানপূর্ণ হলে নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা। ব্রজলীলা তত্ত্বে নির্বিকল্প সমাধি অস্বীকৃত নয়। এই অবস্থাকে ব্রজলীলায় শান্তভাব বলা হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য কিন্তু একই। জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহন করলে তবেই প্রেমরস আস্বাদন সম্ভব। উপনিষদের বর্ণিত ব্রহ্মের মাধুর্য-ময় আনন্দতত্ত্ব থেকেই একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরানে যেসব তত্ত্বকথা আলোচনা করা হয়েছে তার অনেক স্থানেই উপনিষদের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় উপনিষদের মন্ত্র উল্লিখিত আছে। শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিষদ ও দর্শন' গ্রন্থে জানা যায় 'ঋষি' বেদব্যাস যখন ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা-গুলির সমন্বয় সাধন করা। উপনিষদ পড়ার পর ভাগবতের ব্রজলীলা আস্বাদন করলে অভূতপূর্ব আনন্দলাভ করা যায়। উপনিষদের ব্রহ্মানন্দই ব্রজলীলার মাধুর্য হিসাবে আস্বাদ হয়েছে।

শক্তি তিনভাবে প্রকাশিতা। স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। স্বরূপশক্তির সঙ্গে শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তাই নিত্যলীলা। মায়াশক্তির ও জীবশক্তি ঐ নিত্যলীলা সৃষ্টিতে সহায়ক। জীবশক্তি স্বরূপ ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী। কখনও জীব মায়াশক্তির প্রভাবে বহির্ম্মুখ হয় কখনও স্বরূপশক্তির প্রভাবে অন্তর্মুখ হয়। বিচার বুদ্ধি দিয়ে—বিবেচনা করলে ব্রজলীলা আস্বাদন করা যায় না। সেজন্য চাই বিশ্বাস। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য / মামেকং শরণং ব্রজ"

সর্বধর্ম্ম ত্যাগ করে আমাতেই স্মরণ নাও। সমগ্র গীতা শোনার পর অর্জুন নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছেন আমার আর মোহ নেই আমি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। গীতার চরম সত্য শরণাগতি একথা অর্জুন বুঝেছিলেন বলেই শেষে সর্ব সংশয় পরিত্যাগ করে সত্যের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়েও যে ভক্তাধীন একথা স্বীকার করেছেন নিজেই। শ্রীভগবানকে ভালবাসলেই তিনি নিজে এসে ধরা দেন ভক্তের কাছে। এই ভক্তি ভাব সবশেষে মহাভাবে পরিণত হয়ে কৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে—আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীরাধারূপে। এই প্রেমময়ীর প্রেমকণিকাই মাতা, পিতা, পুত্র, বন্ধু ও স্ত্রীরূপে জগতকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। সব সম্পর্কের সূত্রপাত ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছে।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে
"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুন।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও উপনিষদের ব্রহ্মর বাসনা একই বস্তু। তিনি রসিক শেখর চতুর চূড়ামণি। প্রেমরস আস্বাদনে সদাই উন্মুখ। রসিক যেমন একদিকে রস আস্বাদন করেন তেমনি রসের বিস্তৃতিও চান। রস একাধারে আস্বাদিত ও বিস্তারিত।

মায়াবাদের ব্রহ্ম যত বড়ই হোন না কেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। শ্রীভাগবত বলেন "এতে চাংশকলা ঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ॥"

যে সকল অবতার ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন সকলেই অংশাবতার। একমাত্র কৃষ্ণই ভগবান। তিনিই অনাদি, সর্ব্বাদি। সর্ব্বকারণের কারণ।

অনাদিরাদি গোবিন্দ ঃ "সর্ব্বকারণম্।"

শ্রীকৃষ্ণ কারো অবতার নন। তিনি স্বয়ং পূর্ণ। তিনি অখিলাত্মা তিনিই আদি পুরুষ। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আদ্যপুরুষের আদি বীজ। তিনি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কারণসমূহেরও বীজ কারন। তিনি ভগবান অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী প্রভৃতির পূর্ণ আধার।

স্বয়ং অনন্ত হয়েও নিজ লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তগত-প্রাণ। অত্যন্ত প্রেমময়। আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এবং লীলাকাদম্বিনীরূপা নিজ মাধুরীবর্ষণের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন ধরাধামে। সেই অপরূপ রূপচ্ছবি দর্শন করে প্রেমিকভক্ত গাইল—

"বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল কোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরহিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিত
শৃঙ্গারং সখী মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধ হরিঃ ক্রীড়তি ॥

অখিল রসামৃত মূর্ত্তি প্রসৃমররুচিরুদ্ধ কপালি ঃ
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়াম বিধুর্জয়তি । :(ভক্তি রসামৃতসিন্ধু)
তাসামাবির ভূচ্ছৌরি স্ময়মান মুখাম্বুজ
পীতাম্বরধব স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথঃ মন্মথঃ (ভাগবত)

তিনি তো কেবল জগৎপতি নয় জগতাত্মা। তিনি সকলের আত্মা। আত্মা সকলেরই প্রিয়। পুত্র থেকে প্রিয়—বিত্ত থেকে প্রিয়। সকল প্রিয় বস্তু থেকেই প্রিয়।

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ং বিত্তাৎ, প্রেয়স্যাৎ অন্যস্মাৎ, সর্বস্মাৎ, শ্রেষ্ঠ সন প্রেয়সামপি" —সেই প্রিয়তম সেই সুন্দরতম প্রেমধাম বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়ে গোপবালাদের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন। শ্রীবৃন্দাবনলীলা আত্মলীলা একটি মহাসঙ্গীত, অত্যন্ত রহস্যময়। যোগী, ঋষি এবং দেবগণও এর নাগাল পাননা। "শ্রীভগবান ধরাশক্তি দ্বারা আত্ম-লীলার উপযোগী একটি মহাপীঠ বিনোদের জন্য পৃথকভাবে গোলোক মধ্যেই প্রকাশিত করেন। এব পীঠই সহস্রদল কমলাকার মাথুর মণ্ডল। ইহার অন্তবর্ত্তী বিভাগটি গোকুল নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠই শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্বের রহস্য। ইহা ভক্তের জন্য অনাদিকাল হইতে ভগবানের অনাদি ইচ্ছায় রচিত হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানী অথবা কর্মী এইখানে প্রবেশ পথ পায় না। (শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ গোপীনাথ কবিরাজ)"। পৃঃ—৭৩

রস আস্বাদিত ও বিস্তারিত হওয়ার জনাই তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। শক্তি ও শক্তিমান, ভোক্তা ও ভোগ্য আস্বাদক ও আস্বাদ্য ইত্যাদি। মূল এই দ্বৈতভেদ থেকে অনন্ত রসভেদের সৃষ্টি। রসের আস্বাদনও নানা প্রকারে হয়।

রস আস্বাদন ও বিস্তারের জন্য যে ভেদ তা কিন্তু এক রসেরই স্বরূপগত। বহুত্বে—একত্ব স্থাপনই এর মূল লক্ষ্য। প্রেম এক মহাশক্তি। ঐ শক্তি অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে নক্ষত্রমণ্ডল, সৌরজগৎ প্রত্যেককে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে তাদের গতিস্থির রাখে। ঋগ্বেদের ঋষিরাও এই আকৃষ্ট শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন। "আকৃষ্টেনরজসা" রূপশক্তির উল্লেখ তারাও করে গেছেন বহুযুগ আগে।

পরবর্ত্তীকালে আর্য জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (খৃীঃ পূঃ ১০০ বা সমসাময়িক যুগে) 'আকৃষ্ট' শক্তির কথা বলে গেছেন। তাঁর মতে শূন্যে গুরুভার জিনিসকে ঐ আকৃষ্ট শক্তির দ্বারাই পৃথিবী নিজমুখে আকর্ষণ করে। আকৃষ্ট শক্তি রজোগুনের প্রকাশ। বর্তমানযুগের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation)-এর থেকেও রজোগুনের দ্বারা আকৃষ্ট ঐ শক্তির ক্ষমতা অনেক বেশি। ভারতের চিন্তাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় অখণ্ড মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে সর্বত্রই এক বিরাট শৃঙ্খলা কাজ করে চলেছে। আমরা জানি যে সমপ্রকার তাড়িৎ বেগ—পরস্পরের বিপরীতে যায় কিন্তু পুরুষ (Positive) ও স্ত্রী (Negative) এই দুয়ে—দেখা হলে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বহুযুগ পূর্বেও বৈশেষিক জৈন দর্শন একই কথা বলে গেছেন যদিও তখনকার আকৃষ্ট শক্তি-র অর্থ অনেক ব্যাপক ছিল যা আজ লুপ্ত।

রসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের—প্রভাব ধরে পদার্থের তিনটি অবস্থা বোঝানো হয়ে থাকে। বায়বীয় (gaseous) তরল (Liquid) এবং সলিড (Solid)। এই তিনটি থেকেই Electron পাওয়া যায়। Electron-কে Negetive

বলে। Hydrogen Atom-এর থেকেও Electron হাল্কা। Atom-এর সারাংশের নাম ঘনকেন্দ্র (Nucleus) ঐ মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঘনকেন্দ্রের চারদিকে Electron ঘুরছে। Atom-এর energey নির্ভর করে Electron এর বিশেষ অবস্থানে। Eelectron-কে Atomic energey প্রয়োগে Redio active পরিবর্তনে সীসাকেও স্বর্ণে পরিণত করা যায়।

পদার্থের যে বায়বীয় তরল এবং নিরেট অবস্থা তার কারন হিসাবে বলা যায় বিপ্রকর্ষণের আধিক্যই বায়বীয়তার কারন। আবার আকর্ষণের আধিক্যই বস্তুর নিরেট অবস্থা। এর সাম্যাবস্থায়ই তরলতা আসে।

বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কনাদ (অন্য নাম উলুক) ছিলেন পরমাণুবাদী। তাঁর মতে সূর্যরশ্মিকনাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রতম অনু। বহু শতাব্দী পেরিয়ে এসেও বর্তমান বিজ্ঞান 'কনাদ'-কেই সমর্থন করে চলেছে। বিশ্বজগতে যে শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়—তাই আত্মচৈতন্যমুক্ত চিৎশক্তি এবং ঐ শক্তিই আনন্দময় রস।

রস অনন্ত। রস—বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য এবং ভাববশীভূত মিলনই এর প্রকৃতি এবং অনন্ত তাই এর ধর্ম রসকে উপলব্ধি করতে হলে চাই ভাবরূপ শক্তি। রস শক্তি-মান ভাব শক্তি যাকে আস্বাদন করা যায় তাই রস। সাংখ্য অর্থে ভব। ভবের প্রকাশ ভাব। ভাব ছাড়া সৃষ্টি হয়না। প্রাচীনযুগের ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "রসো-বৈসঃ।" ব্রহ্ম রসরূপ। তিনি অনাদি—চিরন্তন তাই তিনি আদিরস।

ভরতমুনি বলেছেন বিভাব অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবের সমন্বয়ে রসোৎপত্তি হয়। এই তিনের সম্মিলিত রূপই রসকে প্রকাশ করে। অন্তরকে যা বিভাবিত করে তাই বিভাব। বিভাবের পরই অনুভাব। এছাড়া—যা বিশেষভাবে অভিমুখে ধাবিত হয়—তাই ব্যাভিচারী ভাব। আবার বিভাবের দুটি রূপ অবলম্বন ও উদ্দীপন। অবলম্বন হলে সেই পূর্ণরস স্বরূপ। এবং উদ্দীপন এই বিশ্ব প্রকৃতি।

জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রহ্মার তিন শক্তি কাজ করে। চরিতামৃত বলেন—

"অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তিপ্রধান
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।।"

শাস্ত্রে সচ্চিদানন্দের—এই তিনটি শক্তির নাম হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।"

সৎভাবে যে শক্তি কাজ করে তারই নাম সন্ধিনীশক্তি। এই সন্ধিনীশক্তির প্রভাবেই বিশ্বজগত কর্মময় তাঁর শাসনেই অগ্নি তাপ দেন। চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু সকলেই স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন।

চিৎভাবের যে শক্তি তার নাম সংবিৎ। এই শক্তির প্রেরণাতেই জীবজগৎ সদা সচেতন। সংবিৎ-ই জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেই তিনি জীবজগতের অন্তরস্থ অজ্ঞান বিদূরিত করেন।

সবশেষে আনন্দভাবের প্রকাশ যে শক্তির মাধ্যমে হয় তাই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তিতেই তিনি নিজে আনন্দময়। নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করে জীবজগতকে

আনন্দ দান করেন। তাই উপনিষদ বলেছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দর প্রয়ন্ত্যভিসংবিসন্তীতি।"

অর্থাৎ জীব সেই আনন্দস্বরূপ থেকেই এসেছে। আনন্দদ্বারাই বেঁচে আছে। আনন্দের অভিমুখে চলেছে আবার সেই আনন্দস্বরূপেই প্রবেশ করছে। এই আনন্দই উচ্চতম গ্রামে প্রেমরূপে রঞ্জিত হয়। হ্লাদিনীর সারই হল প্রেম। আর এই হ্লাদিনীশক্তিরই অন্য নাম শ্রীরাধিকা। যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধিকা। তাই রসিকশেখর শ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকার বশ। শ্রীরাধা সমস্ত সৌন্দর্যের মাধুর্যের লাবণ্যের মূলাধার। তিনি কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণগতপ্রাণা। তাঁর বদনে কৃষ্ণনাম, নয়নে কৃষ্ণরূপ। তাই ভক্ত কবি গাইলেন—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী
গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমনি
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে—তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

হ্লাদিনী শক্তিকেই শুধুমাত্র শ্রীরাধার আধার বললে সম্পূর্ণরূপে বলা হয়না। সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী এই তিনটি শক্তির সমষ্টিভূত স্বরূপ শক্তিই হলেন রাধা। এগুলির মধ্যে হ্লাদিনীর প্রাধান্য বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র হ্লাদিনী রূপেই শ্রীরাধাকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

হ্লাদিনী শক্তি নিঃসৃত ভক্তবৃন্দও হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপ প্রেমভক্তির পূর্ণবিকাশই সাধনার সমাপ্তি। প্রেমভক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি মহাভাবরূপা স্বয়ং শ্রীরাধা। এই কারণে রাধাভাব প্রাপ্ত হয়ে তবেই কৃষ্ণসাধনার অধিকার জন্মায়। তার আগে নয়। পরমার্থতঃ রাধা কৃষ্ণ একই তত্ত্ব তবু লীলারস আস্বাদনের জন্য তারা দুই দেহ ধারণ করেন। কবি বলেছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদে।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের আর্দ্ধাংশস্বরূপা, মূলপ্রকৃতি।

মমার্দ্ধাংশ স্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নে দাহিকাশক্তিঃ
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্।

তিনি বলেন তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। আমাদের মধ্যে নিশ্চিতই কোন

ভেদ নেই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা অগ্নিতে যেমন দাহিকা পৃথিবীতে যেমন গন্ধ তেমনি আমি তোমাতে সর্বদাই আছি।

"সৃষ্টেরাধার ভুতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ।"

তুমি সৃষ্টির আধারভূতা—আমি অচ্যুতবীজরূপী।

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্তয়ৈব রহিতংযদা

শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তেহি ত্বয়ৈব সহিতং পরম

সর্বশক্তি স্বরূপানি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ।।

আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি তখন লোকে আমাকে কৃষ্ণ বলে—তোমার সঙ্গে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি সকলের এবং আমার শক্তিস্বরূপা।

প্রকৃতই রাধা বিনা কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণ বিনা রাধা নেই। ভগবান পূর্ণ—তাঁর কোনই অভাব নেই। তবু নেহাৎই খেলাচ্ছলে তিনি জগতের সঙ্গে খেলা করে যান। খেলতে হলেই সাথী চাই। তাই তিনি দ্বিতীয় হতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কেবল দুই হলেও হয়না বহু না হলে তো রাসাদি লীলা সম্ভব নয়। তাই শ্রীরাধিকা হতে কান্তাগনের বিস্তার।

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি। গোপীরা তাঁর প্রেয়সী। গোপীদেহ ছাড়া অন্য দেহে তাঁর ভজন সম্ভব নয়। গোপীর ভজনই যে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভের উপায়—ভজন শাস্ত্রের—তাই—চরম সিদ্ধান্ত। মানবমনের পুরুষোচিত মধুরভাবে উপাসনা সম্ভব নয়। রমনীহৃদয়ই প্রেমের আধার ও উৎস। নিউম্যান প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও অভিমত এই যে মানুষের আত্মা যখনই নারীহৃদয়ের প্রেমভাব নিয়ে শ্রীভগবানের উপাসনায় ব্রতী হয়—তখনই সে সাধনার গুপ্ত রহস্য অনুধাবন করতে পারে। 'স্টুয়ার্ট মিল'-ও—তাঁর Sujection of Women গ্রন্থে নারী হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। নারীত্ব প্রাপ্ত হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। এ শুধুমাত্র বৈষ্ণবদেরই কথা নয়। ইংলণ্ডের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউতে—শ্রীমতী সুইনি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "The ultimate destiny of men is to become a women."

অর্থাৎ নারীরূপলাভই মানুষের চরম পরিণতি। এ প্রসঙ্গে যীশুও বলেছেন—

When that which is perfect is come,
then that which is imperfect shall
be done away and the two shall
be one the wate as thc female.

অর্থাৎ পূর্ণতার আবির্ভাবে মনুষ্য নারীরূপে প্রকটিত হইবে। (শ্রীরায় রামানন্দ)। পৃঃ-২৮৭ প্রেম এক মহাকর্ষণী শক্তি। প্রেমের আধিক্যে বস্তুর সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রেমই জীবের সাধ্যবস্তু।

কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যে কর্ম্মই করা যায় তাই নিষ্কাম কর্ম। শ্রীমদ্ভাগবদগীতার

এই নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রাথমিক সাধন। ব্রহ্মজ্ঞানীর যা চরম সাধ্য বৈষ্ণবসাধনার তাই প্রথম সোপান। প্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রেমভক্তির প্রথম সোপান দাস্য।

দাস্য প্রেমে প্রভু ভক্তের কাছে প্রিয়—এবং সুহৃদ হয়েও ভক্ত তার দাস—নিঃসংকোচে দাস। এই দাস্য প্রেমেও ভক্তের চারটি ভাগ আছে। অধিকৃতভক্ত, আশ্রিতভক্ত, পরিষদ ও অনুগামী। দেবতারা অধিকৃতভক্ত। আশ্রিতভক্ত—আবার তিনরকম। শরন্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ। কালিয়নাগ, জরাসন্ধ কর্তৃক অত্যাচারিত রাজারা ছিলেন শরন্য। যারা আগে জ্ঞানী ছিলেন পরে দাস্যরসের সন্ধান পেয়েছেন তারা জ্ঞানীচর যেমন সনকাদি ঋষিগণ। যারা প্রথম থেকেই সেবানিষ্ঠ তারা হলেন চন্দ্রধ্বজ, হরিহর ইত্যাদিরা। উদ্ধব ও দারুক এবং উপনন্দাদি—গোপগণ হলেন 'পরিষদ'-ভক্ত। শেষ স্তরে অনুগামী। অনুগামীদের আবার কয়েকটি ভাগ আছে। যারা সপরিবারে কৃষ্ণসেবক তারা ধুর্যভক্ত। যারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীদের মধ্যে অতি আদরযুক্ত তারা ধীরভক্ত আর যারা কৃষ্ণকৃপালাভে সদাআনন্দিত তারা বীরভক্ত।

দাস্যবস্থায় অযোগ, যোগ ও বিয়োগ তিনটি অবস্থা থাকে। প্রথমে দর্শনের আগে অযোগ। দর্শনের পরে যে—বিচ্ছেদ তা হল বিয়োগ এবং মধ্যাবস্থার নাম যোগ।

দাস্য প্রেমের পর—আসে সখ্যভাব। সখায় সখায় যে প্রেম সেই প্রেমের ভাবই সখ্য। সখ্যভাবে ভক্তের চার অবস্থা। যারা কৃষ্ণর চেয়ে বয়সে বড় তারা সুহৃদ— যেমন সুভদ্র বলভদ্র প্রভৃতিরা। এরা ছিলেন কিছুটা বাৎসল্যপরায়ণ। যারা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে ছোট তারা হলেন সখা। বৃষভ, দেবপ্রস্থ প্রভৃতিরা—'সখা'-পর্যায়ভুক্ত। যারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণেরই সমান তারা—ছিলেন প্রিয়সখা—যেমন শ্রীদাম সুদাম। এছাড়া যারা তাঁর লীলারহস্যের সহায় তারা হলেন প্রিয়নর্মসখা। যেমন সুবল মধুমঙ্গল প্রভৃতিরা।

দাস্যভাবের চেয়ে সখ্যভাব উচ্চতর। তার চেয়েও মধুরভাব হল বাৎসল্যভাব। যশোদা এই ভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে ভাগবৎ বলেছেন—

নন্দ কিমকরোদ ব্রাহ্মণ শ্রেয় এব মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যা স্তনংহরিঃ।

অর্থাৎ হে ব্রহ্মণ্ নন্দ কি শ্রেষ্ঠ তপশ্চর্যাই না করেছিলেন যার জন্য তিনি শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে পেলেন। আর যশোদাও কি মহাভাগ্যবতী যে সাক্ষাৎ হরি তার স্তন পান করলেন।

শ্রীভগবানকে পুত্ররূপে ভজনাকরা মহাভাগ্যের কথা। বাৎসল্য প্রেমে অধিকার অনেক। তাই সখ্য প্রেমের চেয়ে বাৎসল্য অনেক উচ্চভাব। যশোদা-উপনন্দ রোহিনী দেবকী বসুদেব ও কুন্তী এরা হলেন বাৎসল্যরসের আশ্রয়ালম্বন। বাৎসল্যের স্নেহ প্রেমেরই এক ঘনভাব। কিন্তু চরমতত্ত্ব নয়।

রায় রামানন্দ যখন মহাপ্রভুকে ভাবগুলির কথা একে একে বললেন তখন বাৎসল্য-ভাবের কথা শোনার পরও মহাপ্রভু বাৎসল্যকে 'উত্তম' বলে স্বীকার করেছিলেন বটে কিন্তু তবুও বললেন

'এহোত্তম আগে কহ আর—

বেদান্তের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা 'শান্তভাবেই' নিবৃত্ত হয়ে যায়। তারপরই ব্রজের ভাব শুরু। ধাপে ধাপে চারটি স্তর অতিক্রম করে তবেই ব্রজসুন্দরীদের মধুর ভাব উপলব্ধি করা যায়। মধুরভাবে পূর্বোক্ত চার ভাবই আছে। তাই চরিতামৃত বলছেন

"গুনাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে॥

পৃথ্বীতত্ত্বে যেমন পাঁচ গুণ বর্ত্তমান তেমনি মধুরভাবেও পাঁচটি গুণ বর্তমান থাকায় এর মাধুর্য আরো বেড়েছে। প্রেমরসের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কিন্তু ব্যাখ্যা চলে না। ব্রজলীলায় রস আস্বাদনের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। রসের আশ্রয় কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিস্বরূপা ব্রজের গোপ গোপী ও অন্যান্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনুভবের জন্য গোপীরা সদাই ব্যাকুল। সেইরস আস্বাদন করতে শ্রীকৃষ্ণেরও বাসনা জাগে। এক্ষেত্রে প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়—রসে মিলিত হয়ে আবার রসের মাধ্যমেই বিপরীতমুখী হচ্ছে। এইভাবে নব নব রূপে রস নিত্য-প্রবহমান। এই ভাঙ্গা গড়াই নিত্য বৈচিত্র আনছে বিরহ ও মিলনের মধ্য দিয়ে। পূর্ণ মিলনেও আছে প্রেমবৈচিত্ররূপ বিরহ। আবার পূর্ণ বিরহে ভাব সম্মেলন ঘটে। বিরহ যত গভীর—ভাবনা তত গভীর হয়। ভাবনা গভীর হলে ধ্যান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীরাধিকার বিরহ যত তীব্র হয়েছে ততই ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মিলন হয়েছে নিবিড়। বিরহের শেষ অবস্থায় শ্রীরাধিকার অন্তর কৃষ্ণময়। বৈষ্ণব কবিদের কাছে—শ্রীরাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ তাই এত মধুর।

প্রেমতত্ত্বের এই ভাঙ্গাগড়ার কথা পাওয়া যায় বৃহদারন্যক ও শ্রুতিতে—যদিও—অন্যরূপে। বৃহদারন্যক উপনিষদে পাই—"সঃ বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ।

মূল তত্ত্বকে এখানে সঃ বলা হয়েছে। তিনিই রমন ইচ্ছায়—স্ত্রী-পুরুষ ভেদে পরস্পর আলিঙ্গিত হয়েছেন।

বৃহদারন্যক উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোক থেকে এই ভাঙ্গাগড়া সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা করা যায়। চতুর্দশ শ্লোকে ঋষির কথানুযায়ী 'দ্বৈতমিভবতি'—অবস্থায় প্রেমের যথার্থ আস্বাদন ঘটে।'

একই রস নিজেকে আস্বাদনের জন্য ও নিজে আস্বাদ্য হওয়ার জন্য নিজেকে বিস্তার করে। এই একই কথা বিভিন্ন শাস্ত্রমাধ্যমে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। উপনিষদে একদিকে যেমন ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলা হয়েছে তেমনি 'রসো বৈসঃ' —একথাও ব্যবহার করা হয়েছে।

জ্ঞান প্রেমেরই অঙ্গ। জ্ঞান রসে মাখামাখি হওয়ার অর্থই প্রেম। নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযুক্ত রেখে নিজ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে—রসাস্বাদন করাকেই প্রেম বলা হয়। ব্রজের মূল ভাবই প্রেম। বৈষ্ণব সাধনা মূলতঃ পরকীয়া ভাবের সাধনা। নিত্য সত্য স্বরূপের সন্ধান করতে হলে চাই পরকীয়া প্রেমভাব।

রস শক্তিমান ভাবশক্তি। যা আস্বাদনীয় তাই রস। রস অখণ্ড। ভাব সাধনায়

পরকীয়ার স্থান অতি উচ্চ। কিন্তু ব্রজধাম ছাড়া পরকীয়া ভাবের কোথাও অবস্থিতি নেই।

বহুদিনের অদর্শনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণদর্শন আশায় উন্মুখ। মাঝখানে কেটে গেছে অনেক কাল। মথুরা থেকে দ্বারকা তারপর আবার এই কুরুক্ষেত্রে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে তিনি এসেছেন কুরুক্ষেত্রে তীর্থস্নানের জন্য। তাঁর সঙ্গে অগণিত সেনা, এবং যাদব প্রধানরা—রয়েছেন। মাতা দেবকী এবং মহিষীরাও সঙ্গে আছেন। বহুলোক এসেছেন কৃষ্ণদর্শনে। এখবর পেয়ে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন যশোদা, নন্দগোপ, ব্রজরাখালগণ এবং গোপীবৃন্দ। আর এসেছেন শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয়সখী পরিবৃতা হয়ে। বহু প্রতীক্ষার শেষে কৃষ্ণদর্শন হল—কিন্তু কোথায় যেন ব্যবধান রয়ে গেল। রাধারানী বৃন্দাবনের জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। বললেন সেই আমার প্রিয়র সঙ্গে মিলন হল সেই আমি রাধা—তবু এ মিলনে সে আনন্দ নেই। ব্রজধামের সেই মুরলীর সুর কালিন্দীর বাতাস-মাখা ব্রজবনস্থলীর জন্য আমার মন কেমন করেছে। এই হল পরকীয়া ভাব। শ্রীরূপ লিখিত এই উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরকীয়া ভাব সাধনার—মর্ম উপলব্ধি করা যায়।

অতলান্ত সাগর—সুউচ্চ প্রাচীর দুর্গম পর্ব্বত কোনো কিছুই ভাবসাধনার পথিককে নিরস্ত করতে পারে না। প্রেমের পথে প্রেম ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম নেই।

এই সাধনার পথে অন্যতম পাথেয় হল সর্বস্বত্যাগ। মধুর বৃন্দাবনের নায়ক—রসস্বরূপ। তিনি চিরসুন্দর—চিরকিশোর। যিনি নায়িকা তিনি মহাভাবময়ী চিরকিশোরী। অতুলনীয়—সৌভাগ্যই তাঁর কপালের তিলক—। তাঁরই কণ্ঠহারের মধ্যমণি হল প্রেমবৈচিত্র্য। প্রেমপথ পবিত্র ভক্তি বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের পথ। এ পথ বড় দুর্গম।

নিজের জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন মীরা। তাই তাঁকেও বলতে হয়েছে

জ্যো মৈ এসা জানতী
প্রেম কিয়ে দুখ হোয়
নগর ঢিড়রা পীটুতি—
প্রেম ন কী জৈ কোয়।

পথ দুর্গম হলেও—যাত্রী আসে। বন্ধুর পথ ভেঙ্গে যুগে যুগে এগিয়ে চলে তারা সত্যের খোঁজে। সে চলায় ক্লান্তি নেই। এ যাত্রা কি শেষ হবে? কখনো কোনোদিন? তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু তারা এগিয়ে যায়—বিশ্বাসের মশাল হাতে করে। পথ দেখায় ভালবাসা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের এই সর্ব্বত্যাগীনীদের উদ্দেশ্যে উপনিষদের ভাষায় বলা যায়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিথ দুরত্যয়া—
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

———